আমার ফাঁসি হল

মনোজ বসু

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৬৫

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক
সিগনেট ফটো টাইপ
১২৩ বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

বাঁধাই
তৈফুর আলি মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রেস

দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীমান সাগরময় ঘোষ

করকমলেষু

॥ এই লেখকের লেখা ॥

উপন্যাস

আগস্ট ১৯৪২	এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী	জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা	বকুল
বাঁশের কেল্লা	বৃষ্টি, বৃষ্টি
ভুলি নাই	রক্তের বদলে রক্ত
শত্রুপক্ষের মেয়ে	সবুজ চিঠি
সৈনিক	বনের মধ্যে ঘর

গল্প

উলু	একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ	কিংশুক
কুঙ্কুম	খদ্যোত
দিল্লী অনেক দূর	দুঃখ-নিশার শেষে
দেবী কিশোরী	নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের	বনমর্মর
গল্প-সংগ্রহ ১ম খণ্ড	শ্রেষ্ঠ লগ্ন

নাটক

নূতন প্রভাত	প্লাবন
বিপর্যয়	বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন	শেষ লগ্ন

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম, ১ম ও ২য় পর্ব	পথ চলি
সোবিয়েতের দেশে দেশে	নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ

আমার ফাঁসি হল। রাত তিনটে, জীবন-কাহিনী লিখছি। যে দিব্যি করতে বলবেন, রাজি আছি। সত্যি সত্যি ফাঁসিতে ঝুলেছিলাম আমি। সেই থেকে এক মজার অবস্থা। দিনমানে আপনাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াই জীবন্ত নরমূর্তিতে। হাসি পায়, ছদ্মবেশ কেউ কখনও বুঝতে পারেন না। এবং আমি একা নই, আমার মতন আরও কতজন আছেন। আপনাদের ভাই-ব্রাদার, আত্মীয়বন্ধু। টের পেলে আঁতকে উঠবেন। রূপকথায় শুনেছেন, রাক্ষসী রাজরানী হয়ে থাকে ; রাত্রিবেলা ঘুমন্ত রাজার পাশ থেকে উঠে চরে ফিরে বেড়ায়। মানুষের ঘাড় মটকে তাজা রক্ত শোষে, হাতিশালে ঢুকে হাতির শুঁড় ছিঁড়ে নটের ডাঁটার মত চিবোয়। ভোর হবার মুখে ভয়ঙ্করী ভোল পালটে আবার রাজবধূ। শান্ত লাজবতী, রূপে-গুণে জুড়ি মেলে না। নিতান্ত গল্প-কথা বলবেন আর কী করে ? আমিই তো সেই একটি। তবে ঘাড় মটকাই না, রক্তমোক্ষণে রুচি নেই, শাক-চচ্চড়ি-ভাতেই তুষ্ট। মরে গেছি, তবু কিছুই যেন হয় নি এমনিতরো ভাব।

রাতের বেলা লিখছি, দিনমানের ভদ্র পোশাকে চালচলন উৎকট লাগছে এখন। চম্পার কাছে একদিন বলছিলাম, সে তো হেসেই কুটিকুটি : উঃ রে, এত কল্পনা খেলে তোমার মাথায়! আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা খাতির বন্ধুত্ব—চম্পা বলে, ও তোমার দিনমানের স্বপ্ন—আসলে কিছুই নয়। আমি কিন্তু চম্পার মতন অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারি নে। কিছু সন্দেহ থাকে। সত্যিই কি অহরহ আপনাদের ঠকাচ্ছি মরে যাবার পরেও ? কে বলে দেবে খাঁটি খবর, কার উপর ভরসা করব ?

রাত তিনটেয় এইসব ভাবছি ; দিনের বেলা আর-এক রকম। তখন মনে হয়, রাতের এইগুলোই আজগুবি। আমার দুই জীবন,

দুইরকম অস্তিত্ব। রাতে যা আছি, দিনে তা নই। রাত বলে, দিনমান প্রহেলিকা। দিন হাসে ঃ রাতের ঐসব বিদঘুটে স্বপ্ন। জন্মের পর থেকে বেঁচে ছিলাম, অথবা ফাঁসির পরেই বেঁচে উঠলাম—কার কাছে খাঁটি জবাব পাই?

আপনারা যাদের জীবন্ত বলেন, এই নিশিরাত্রে কাউকে তাদের পাচ্ছি নে। কলম হাতে নিয়ে বসেছি—চম্পা কোনদিকে আছে, হয়ত বা ইচ্ছে করেই সরেছে লিখবার অবাধ অবসর দিয়ে। আরও ঘণ্টা কয়েক পরে আপনাদের দিনমান হবে। এদের তখন রাত্রি—জ্বলজ্বলে সূর্যের আলোয় ভরা সুপ্তিমগ্ন রাত্রি এদের। শুয়ে পড়ব, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব কত রকম। তখন আবার মনে হবে, এখনকার এই সত্য অস্তিত্বই বুঝি স্বপ্ন। কী রকম ধাঁধা ভাবুন দিকি! স্বপ্নে জাগরণে গোলমাল লেগে যায়। স্বপ্ন কি লাবণ্য, অথবা স্বপ্ন এই চম্পা? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে, পাগল না হয়ে যাই।

যা হোক একটা সাব্যস্ত করে নিন আপনারা নিজ নিজ মরজি মত। আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি গল্প বলে খালাস। আমার আত্মকথা—সেই যখন আপনাদের মত দেমাকে ধরাতলে ধুলো উড়িয়ে বিচরণ করতাম। কিংবা স্বপ্নের ঘোরে মনে হত, বেঁচে থেকে বহাল তবিয়তে ঘুরছি আপনাদের মতন লোকজনের সংসারে।

বনেদি বাড়ির ছেলে। এমন দিন ছিল, ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানো হত আমাদের বাড়ি। ভাঙা কলকব্জা জঙ্গলের মধ্যে জং ধরে পড়ে আছে, গিয়ে দেখতে পারেন। কর্তারা গেলেন, তারপরে কী অলক্ষ্মী ভর করল—আট শরিকের মামলা-মোকদ্দমায় সমস্ত উড়ে-পুড়ে গেল চোখের উপর দিয়ে। আজ এ তালুকটা নিলাম হচ্ছে, কাল ওই খামারটা। এরই মধ্যে এক আশ্বিনের ঝড়ে বাগানের প্রায় সবগুলো ভাল গাছ-গাছালি উপড়ে

পড়ল। নৌকোডুবি হয়ে বছর-খোরাকি ধান-চাল গেল গাঙের নীচে। ধনসম্পত্তি পাখনা মেলে পত-পত করে উড়ে পালাচ্ছে। মা-বাবা আগেই গেছেন, তখন আমি ছেলেমানুষ। বাবা গেছেন, মাথার উপর দাদা আছেন অবশ্য। আছেন বউদি ও ছেলেমেয়েরা। এবং বনেদি পরিবার বলে কিছু আসবাবপত্তর, খানকয়েক রুপোর বাসন, গয়নাগাঁটি দু-চারখানা।

সম্বল মাত্র এই। যে জায়গায় এত হাঁক-ডাক পশার-প্রতিপত্তি, ঘাড় নিচু করে নিতান্তই দশের একজন হয়ে সেখানে টেকা যায় না। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে গিয়ে সুবিধা হল। ঐ নাম করে কলকাতায় গিয়ে উঠলাম। শহরে কে কাকে চেনে? ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র, কোঁচার মুড়োয় দু-সের চাল কিনে আনছি, কেউ তা তাকিয়ে দেখতে যাবে না।

আরও হল। উদ্বাস্তু হওয়ার দরুন কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর দাদা এক চাকরি পেয়ে গেলেন। এক কারখানার সালতামামি খাতা লেখার কাজ। আমিও কলেজে ঢুকে টপাটপ গোটা দুই পাস করে ফেলেছি। চাকরি করা এবং পাস করা—দুটো ব্যাপারের কোনটাই আমাদের কোন পুরুষে হয় নি। পাস করে আলস্যে বসে নেই—যে ব্রতের যে রকম বিধি—খবরের কাগজ দেখে নিয়মিত দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু শহরে ঘোরাফেরা করলেও আসলে মফস্বলের মানুষ তো, কাকে ধরলে কী হয় এই তত্ত্বে একেবারে আনাড়ি। দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে স্ট্যাম্পের খরচা মোটা অঙ্কের হয়ে উঠল, ফল কিছু হয় না। মরীয়া হয়ে তখন বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়তে লাগলাম। তাতে উল্টো উৎপত্তি—দরখাস্ত ঘুরে এসে ডবল মাশুল আদায় করে নিয়ে যায়।

একবার ইতিমধ্যে এক সরকারি পরীক্ষায় বসেছিলাম। এবং কী আশ্চর্য, খবর পেলাম পাস হয়ে গেছি নাকি টায়েটোয়ে। বাপ-ঠাকুরদার পুণ্যবল ছিল, নয়তো এরকম অঘটন ঘটে না। তারপরেও আছি বসে—বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে তাস খেলি, গুলতানি

করি, গানের গলা থাকায় পাড়ায় কিছু নাম হয়ে গেছে—হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে চেঁচাই কখনো-সখনো। দরখাস্তের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, একটা-দুটো ছাড়ি পছন্দমত পেলে। বউদি ওদিকে উঠে পড়ে কনে দেখে বেড়াচ্ছেন। ঘটকী লাগিয়েছেন; চেনা-জানার ভিতর যাকে পাচ্ছেন, তাকে বলেন। চাকরি হচ্ছে না তো বিয়েটা হয়ে যাক। আমার এই বয়সে পৌঁছবার আগেই আমাদের বাড়ির সকলেই ছেলেমেয়ের বাপ। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু একটা মানুষ আধা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাই বা চোখ মেলে কী করে দেখা যায়? স্ত্রী-ভাগ্যে ধন—চাকরি-বাকরি এবং যাবতীয় সুখ-সৌভাগ্য আটকে রয়েছে শুধু একটি ভাগ্যবতী স্ত্রীর অপেক্ষায়।

বছর দেড়েক এমনি যায়। হঠাৎ সরকারি চিঠি, আমাকে সাবরেজিস্ট্রার করা হয়েছে বিরাটগড় নামক জায়গায়। জায়গায় বসবার আগে আট সপ্তাহের শিক্ষানবিসি। বউদি বেঁকে বসলেন: উঁহু, এখন কী করে যাওয়া হয়?

এক্ষুনি যেতে হবে। কাল-পরশুর ভিতর। কত ভাগ্যে চাকরি জুটেছে।

দাদারও সেই মত। ফাগুনের আর পাঁচটা দিন আছে। চোত পড়ে যাবে, তার আগে রওনা হয়ে পড়।

বউদি বলেন, চোত পার করে বোশেখে হাতিবাগানের মেয়ে ঘরে এনে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যাবে। খাসা মেয়েটি।

রাশভারি মানুষ দাদা, কম কথা বলেন। যা বলেন, হুকুমের মত আমার কাছে। আমি সরে পড়ি, অন্তরালে যাই। বুঝুন এবারে দু-জনে। দুই গুরুজন আমার।

দাদা বলেন, চাকরি বসে থাকবে না তোমার খাসা মেয়ের খাতিরে।

বউদি বলেন, না থাকে অন্য একটা দেখে নেবে। আরও দু-চার মাস পরে হবে না হয়। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে বসে নেই

তো ঠাকুরপোর চাকরির আশায়। বোশেখ নিদেন পক্ষে জষ্ঠির পর মেয়ে তারা ঝুলিয়ে রাখবে না, অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করবে।

গোটা তিরিশ জায়গায় বাতিল করে এই মেয়ে খানিকটা বোধহয় বউদির মনে ধরেছে। দেওরকে কী তালেবর যে ভাবেন! দুনিয়ার তাবৎ মেয়ে একটা জায়গায় সভা করে বসিয়ে তার ভিতরে বাছাই করলে তবে বোধহয় খুঁতখুঁতানি যেত। ফোটো আমার হাতে দিয়ে বলেন, নাকটা আর একটু খাড়া হলে যেন ভাল হত, কী বল?

নাকই তো দেখি নে বউদি, খাঁদাবোঁচা—পুরোপুরি মঙ্গোলিয়ান।

বউদি রাগ করে বলেন, কুচ্ছো করতে ডাকা হয় নি। চল একবার নিজের চোখে দেখে আসবে।

লোকে পাগল বলবে তা হলে আমায়। চাকরিতে না গিয়ে কনে দেখতে ছুটল।

বউদি চুপ করে গেলেন। এদিকে টুনু আমায় ধরেছে, চিড়িয়াখানায় যাবে ফুলকাকা—

এই তো, ও-মাসে দেখিয়ে আনলাম।

রাঙা-বাঁদর এসেছে একটা। আমি দেখব।

আচ্ছা—

কখন যাবে?

টুনুর মাথায় একটা কিছু ঢুকলে হয়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, এমন কি রাত্রে এক ঘুমের পরে উঠে বায়না: লাল-বাঁদর দেখব, নিয়ে চল।

নাও, ঠেকাও। কী আবদেরে ছেলে বানিয়েছ বউদি!

বউদি বলেন, আমি, না তুমি ঠাকুরপো। আরও তো চারটে ছেলেমেয়ে আমার—করুক দেখি কেউ এরকম। তোমার দাদা তাই বলছেন, টুনুকেও সঙ্গে নিয়ে যাক। আমরা কেউ ও-ছেলে সামলাতে পারব না।

সত্যি, টুনুর জন্য মন খারাপ হচ্ছে। কতদিন আর কোলে করব

না, কোলে বসে আবদার করবে না টুনুমণি! ওকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে বড়। এক লহমা আমার কাছছাড়া হতে চায় না, রাত্রে শোয় আমার কাছে। ছেলের যখন দেড় বছর বয়স, বউদি বড় অসুখে পড়েছিল। দাদার এসব ধকল সয় না। টুনু সেই সময় থেকে আমার নেওটা।

রিকশা ডেকে এনেছি, বউদিও দেখি সেজেগুজে এসে হাজির।

রিকশা কী হবে ঠাকুরপো? হেঁটে যাই এইটুকু, বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরব।

বাপ রে বাপ! চড়চড়ে রোদে তুমিও যাচ্ছ লাল-বাঁদর দেখতে? মায়ের এমন পুলক, ছেলের হবে না কেন?

অনতিপরে টের পেলাম, চিড়িয়াখানার গরজটা বউদিরই। টুনুকে নাচিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখাশুনোর পর ফিরে আসছি। বউদিকে বললাম, খাঁচায় না রেখে তোমার লাল-বাঁদর ছাড়া দিয়ে রেখেছে। আমাদের সামনে এতক্ষণ ঘুরে ফিরে বেড়াল।

কেমন দেখলে বল?

মুখে পোড়ার ছাপটাপ নেই যখন—হনুমান নয়, বাঁদরই। ঠোঁটে লাল নখে লাল পরনে রাঙা শাড়ি—বাঁদর লালই বটে, মিছে কথা বল নি!

বউদি একটু ভেবে বলেন, নাক নিয়ে তুমি খুঁত-খুঁত করেছিলে, নাক কিন্তু ঠিকই আছে। আজ আবার খুঁটিয়ে দেখলাম। তবে রঙটা ফ্যাকাশে মতন। আর একটু ঘোর হলে ভাল হত। কী বল?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, ঠিক তাই। বাঙালির ঘরে অতদূর সাদা হয় কী করে? বোধহয় শ্বেতকুষ্ঠ। আবার যেদিন এই মেয়ে দেখবে, আমি বলি কী, কোন একজন কবিরাজ সঙ্গে নিয়ে যেও।

হেসে ফেলে বউদি বললেন, তোমার মুণ্ডু!

দেওর মোটামুটি পছন্দ করেছে, হাসি সেইজন্য। এই আমার বউদি। যাওয়ার দিনও বলছেন, ওদের বলে-কয়ে রাখব। হপ্তা-

খানেকের ছুটি নিয়ে এস, তাতেই হবে। চাকরিতে বসে খানিকটা সামাল দিয়ে নাও গে, তারপরে ছুটির চেষ্টা কোর।

যখন যাব সে কী কান্না টুনুর! সে-ও যাবে, জুতো-জামা পরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা করা যায় না। দিনমানের গাড়ি বাতিল করি অগত্যা। আর-একটা আছে অনেক রাত্রে, সে-গাড়িতে ধকল বিস্তর। রাত্রি-জাগরণ তো বটেই, তার উপরে এমনিধারা ভিড় যে বসবার জায়গা মেলে না, সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু উপায় নেই, টুনু না ঘুমানো পর্যন্ত বাড়ি থেকে নড়া চলবে না।

টুনু ঘুমিয়ে পড়লে তার হাতখানা তুলে কড়ে-আঙুলে দাঁত ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এইরকম বিধি—আঙুল কামড়ে মায়ার বন্ধন ছেদন করে বেরিয়ে যাওয়া। ফুলকাকার দুঃখে এর পর কোন শক্ত অসুখ-বিসুখে না পড়ে ছেলে।

সদরে মাস দুয়েকের শিক্ষানবিসি। আরও কিছুদিন চেয়েছিলাম, ওঁরা বললেন, এতেই হবে, কাজের ভিতরে পড়ে বাকি সমস্ত শেখা হয়ে যাবে। রেজেস্ট্রি অফিস বিরাটগড়ে অল্পদিন হয়েছে। এর আগে ছিলেন এক প্রবীণ মানুষ। তদ্বির-তদারক করে বদলির হুকুম বের করেছেন তিনি। সদর ছাড়বার আগের দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। জায়গাটার খবরাখবর নিলাম। দাঙ্গার সময়টা বিরাটগড় একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং জমে উঠেছে আবার। অনেক উদ্বাস্তু এসে পড়েছে, জঙ্গল কেটে তারা বসবাস করছে। থানা, পোস্টাফিস, রেজেস্ট্রি অফিস, ফ্রী প্রাইমারি ইস্কুল সমস্ত নতুন। সেকেলে চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি—গ্রামের কয়েকজন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডে টাকা জমা দিয়ে বানিয়েছিলেন—নতুন পাকাবাড়িতে উঠে গিয়ে নাম বদলে এখন হেল্‌থ-সেন্টার হয়েছে। জায়গাটার প্রশংসা করলেন ভদ্রলোক। বললেন, শহরে-বাজারে আমাদের কেউ পোঁছে না, ওখানে খাতিরটা দেখবেন। হোড় মশায় কাজ করেন রেজেস্ট্রি অফিসে। হেসে বললেন, অফিসের ভিতরে নয়,

বাইরের বারান্দায়। দলিলপত্র লেখেন, আর স্ট্যাম্পের ভেণ্ডার। অভাবি লোক, একটু হাতটানও আছে—কোন রকম অসুবিধা হলে তাঁকে বলবেন। বলতেও হবে না। তাঁর হিত করবার ঠেলা সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। সরকারি ডাক্তার আছেন, ভোলানাথের মত মানুষ। এক দোষ, গল্প পেলে হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। মোটের উপর থাকবেন খারাপ নয়। আমার চলে আসতে হল আলাদা কারণে। পি-ডবলিউ-ডি-র গয়ংগচ্ছ কাজ, কোয়ার্টার বানাতে নিদেন পক্ষে তিনটি বচ্ছর এখনও। সংসারি মানুষ, ঘর-সংসার ছেড়ে একা একা কতদিন থাকতে পারি? বয়স হয়ে একটু আয়েশি হয়ে পড়েছি। আপনার তা নয় মশায়। একবার জমে গেলে তারপর বদলি হলেও নড়তে চাইবেন না।

জায়গা ভালমন্দ যা-ই হোক, সে এখন ভেবে লাভ নেই। চাকরি নিয়েছি, যেতে হবে। নদী-খালের পথ। শেয়ারের নৌকো না হলে বেশি খরচা পড়ে। নিজস্ব ভাড়ার নৌকো সব সময় পাওয়াও যায় না। যত প্যাসেঞ্জার সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যের মুখে ঘাটে এসে জমে। নৌকো ছাড়ে তখন।

রাত বেশি হয়ে গেল পৌঁছতে। প্যাসেঞ্জার এ-ঘাটে ও-ঘাটে উঠছে, নামছে। এ তল্লাটের মানুষ সময়ের ধার ধারে না; পৌঁছে গেলেই হল। তার উপরে ভাঁটার জল বড্ড নেমে গিয়েছিল, খালের মধ্যে নৌকো বেঁধে থাকতে হল অনেকক্ষণ। অজানা জায়গা, তবে অসুবিধে এমন কিছু হল না। মাঝি স্থানীয় লোক, খাতির করে লণ্ঠন ধরে সে আমায় বাসাবাড়িতে তুলে দিয়েছে। দোচালা ঘর, বাঁশের বেড়া, গোলপাতার ছাউনি। মাঝি বলে, তক্তাপোশ রয়েছে, বিছানাটা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ুন। রাত বেশি নেই, চোখ বুজতে না বুজতেই সকাল হয়ে যাবে।

লণ্ঠন জ্বেলে রেখে সে চলে গেল। বুদ্ধি করে পাউরুটি আর বাতাসা এনেছিলাম, তাই চিবিয়ে পুকুরঘাটে নেমে আঁজলা করে জল খেয়ে দুয়োরে খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম।

অজানা জায়গা, ভাল ঘুম হল না। ভোরবেলা দরজা খুলে দেখি, পাকা-চুল লিকলিকে-দেহ এক ব্যক্তি দাওয়ার উপর খুঁটি ঠেস দিয়ে চোখ বুজে আছেন। দরজা খুলতে একটুখানি শব্দ—মানুষটি অমনি ধড়মড় করে উঠে কোমর অবধি ঝুঁকে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন : অধীনের নাম দয়ালহরি হোড়—

সেই যে হোড় মশায়ের কথা শুনে এসেছি। ডাকতে হল না, নিজে যেচে এসেছেন। গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন, নিবাস এই বিরাটগড়। আদি বসতি কালনায়। অনেক কালের কথা হুজুর, বর্গির হাঙ্গামার সময় আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভিটে ত্যাগ করে আসেন। জ্ঞাত-গুষ্ঠি আছে সেখানে। হুজুরের জন্য ক'দিন থেকে ঘাটে ঘোরাঘুরি করছি। কালও অনেক রাত্রি অবধি ছিলাম। কোথায় নামা হল, কিছু তো টের পেলাম না। কদমতলার ঘাটে, না গোলবাড়ির ঘাটে ?

কোথায় নামিয়ে দিল, কী করে বলি। কদমগাছ তো দেখলাম না কাছে-পিঠে কোথাও।

হোড় মশায় বলেন, কদমগাছ নেই। ছিল বোধহয় এককালে, নয়তো নাম হবে কেন ? গোলবাড়ির ঘাটে বরঞ্চ ভাঙাচুরো ইটের গাঁথনি রয়ে গেছে। রাত্তির না হলে গোলবাড়িও দেখতে পেতেন। দূর নয় ঘাট থেকে।

তবে গোলবাড়ির ঘাটই হবে। জুতোয় ইটের ঠোক্কর খেলাম, মাঝি তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে আগে চলে এল। দেদার ইট।

মুশকিল দেখুন। আমি সেই সময়টা কদমতলার ঘাটে চটাপট চাপড় মেরে মশা তাড়িয়ে মরছি। ভুল হল, বাসাটা একবার আমার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

একা আসেন নি, উঠানে আর-একটি দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখে চোখে আর পলক পড়ে না। মানুষ, না দত্যি-দানো ? অমন দশাসই জোয়ান পুরুষ বাংলা দেশের মাটিতে বড় একটা দেখি না।

হোড় মশায় বলেন, আমাদের হরিশ। লোকের দরকার হবে

হুজুরের, তাই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার আগে চাটুজ্জে হুজুর ছিলেন, তাঁরও রাঁধাবাড়া করত। রাঁধাবাড়া, কাপড়-কাচা, জল-তোলা, বাসন-মাজা, গা-হাত-পা টেপা সমস্ত করবে। বিশ্বাসী ছোকরা—হাট করতে দিলে আনিটা দুয়ানিটা এদিক-ওদিক করতে পারে। তার বেশি কিছু করবে না। চাটুজ্জে হুজুরও তেমনি, নিজে হাট করতে যেতেন—দু-আনার কুচো চিংড়ি কিনবেন তো দু-গণ্ডা ফাউ চেয়ে নেবেন। না দিলে নিজেই খামচা করে তুলে নেবেন মাছের ডালি থেকে। আপিসের হাকিম, কিছু বলতেও পারে না, কবে কোন্ খত-তমস্থকের ব্যাপারে গিয়ে পড়তে হয়।

ডাকলেন, এই ছোঁড়া, চলে আয় এদিকে। মনিব তোর। মাইনের কথা সামনাসামনি বলে নে। বলছে হুজুর, বারো টাকা। চক্ষুপর্দা নেই আজকালকার ছোঁড়াদের। বারো টাকা এক লাট-সাহেবের মাইনে। আমি বলেছি, হুজুরকে বলে কয়ে আট টাকা অবধি তুলে দেব। কী বলেন হুজুর, বেশি বলে ফেলেছি?

বারো টাকাই দেব আমি।

হোড় ক্ষণকাল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। হরিশকে বলেন, গড় কর্ ছোঁড়া, পায়ের ধুলো নে। গায়ে মাথায় মাখ্। এমন মনিব ভূ-ভারতে পাবি নে। কলকাতার মানুষ, চায়ের অভ্যাস আছে, তাই বুঝে চা-চিনির জোগাড় রেখেছি। জল চাপাতে লাগ্, আমি এক ছুটে দুধ নিয়ে আসি। চা করতে জানিস তো রে?

আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, জানবে কী করে? কৃপণের জাসু ছিলেন চাটুজ্জে হুজুর। অন্য কেউ দিলে খেতেন, নিজের ঘরে চায়ের পাট ছিল না। আচ্ছা, আসি আমি। আমিই চা করে দেব। সব রকম অভ্যাস আছে হুজুর।

বয়স হয়েছে, আর চেহারায় তো শুকনো একখানা লম্বা কাঠি। বেরিয়ে গেলেন তীরের মতন। পয়সাকড়ি কিছু হাতে দেব, তার ফুরসত পেলাম না। আজব মানুষ। কথাই বা ক'টা বলতে দিলেন এতক্ষণের মধ্যে? একাই সব বলেন।

মুখ-হাত ধুয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরছি। দয়ালহরি দেখি হন্তদন্ত হয়ে আসছেন ঘটি-ভরতি দুধ নিয়ে। বলেন, দেরি হয়ে গেল, গাই দুয়ে আনতে হল—চায়ের অভাবে হুজুরের কষ্ট হয়েছে। কাল থেকে এমন আর হবে না।

এত দুধ কেন ?

মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মনোভাব আন্দাজ করে নেন : দুধে রুচি নেই বুঝি ? কাল তবে কিছু বেশি করেই আনব, হরিশ ক্ষীর করে দেবে। দুধ না চলে, ক্ষীর খাবেন।

এবারে ছাড়ি না। মনিব্যাগ বের করলাম। দয়ালহরি জিভ বের করে তিন পা পিছিয়ে যান : সর্বনাশ! ঘরের দুধ—তার জন্য দাম নেব হাত পেতে ? ভগবতীর বাঁটের দুধ জাতগোয়ালা ছাড়া কেউ বেচতে পারে না, বেচলে গায়ে শ্বেতি বেরোয়।

দুধ না হয় হল। কিন্তু চা নিয়ে এসেছেন, সে তো নিজের ক্ষেতে জন্মায় নি। চিনিও গাছের নয়।

হবে, হবে। এমন নির্দয় কেন হুজুর, আমার কোন জিনিস নিতে চাচ্ছেন না ? চাটুজ্জে হুজুর এদিক দিয়ে ভাল—না বলতেন না কখনও। উল্টে নিজে থেকেই কত ফরমাশ করতেন।

বলতে বলতে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। গরম চা বানিয়ে আনলেন কাচের গ্লাসে। হরিশকে বলেন, রবিবার আজ, কাছারির তাড়া নেই। তুই ছোঁড়া জেলেপাড়ায় চলে যা—ভাল মাছ দেখে-শুনে নিয়ে আয়। আমি চাট্টি সরু চালের জোগাড় দেখছি।

চাউর হয়ে গেছে আমার আসার খবর। অনেকে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের মধ্যে বাইরের মানুষ চারজন আমরা—সরকারি ডাক্তার, থানার বড় দারোগা, ছোট দারোগা এবং আমি এই সাব-রেজিস্ট্রার।

সন্ধ্যাবেলা ছোটবাবু এসে থানায় টেনে নিয়ে গেলেন।

ব্রিজ জানেন তো ? অকশানই চলবে, কন্‌ট্রাক্ট আমরা

খেলি নে। আপনার আগে যিনি ছিলেন, একেবারে ঘরকুনো তিনি। ঘরে বসে বসে ঝিমতেন, টেনে বের করা যেত না। বিদেশ-বিভুঁয়ে তু-হাত তাস খেলব, তা এমনি জায়গা—চারটে খেলুড়ে একসঙ্গে জোটানো দায়। আমাদের আবার দেখেশুনে চলতে হয়, বাজে লোকের সঙ্গে মিশলে পজিশন থাকে না। সরকারি কাজকর্মের অসুবিধা হয়।

এখানেও দেখছি দয়ালহরি হোড়। কোচড়-ভরতি পেয়ারা এনে আমাদের মাতুরের উপর ঢেলে দিলেন। সরকারি ডাক্তার বলেন, পেয়ারা গুচ্চের নিয়ে এলেন কেন? খেলে পেট কামড়ায়, বদহজম হয়।

বড় দারোগা বেছেগুছে সুপক্ক দেখে একটা নিয়ে নিলেন। হেসে বলেন, আমাদের বুঝি ছেলেছোকরা ঠাহর করলে হোড়-মশায়। দাঁত কোথায় যে পেয়ারা চিবব?

কাশীর পেয়ারা হুজুর। আমার ঠাকুরদামশাই খোদ কাশীধাম থেকে চারা এনে পুঁতেছিলেন। চিবতে হবে না, গালে ফেললে মাখনের মত আপনি গলে যাবে।

বলে দয়ালহরি আমার পাশে চেপে বসলেন। এদের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি খাতির জমিয়েছেন। ছোটবাবু বাজে লোকজনের কথা বললেন, ইনি তবে সে দলের বাইরে। আমার পাশে বসে জুত দিচ্ছেন; ফিসফিসিয়ে বলেন, কষে সাহেব মেরে দিন, বাঁয়ে টেক্কা নেই।

বড়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন: এই হোড় মশায়, আমার তাস দেখেছ উঁকি দিয়ে। কিচ্ছু বলবে না তুমি—একটি কথাও নয়, খবরদার!

সে কী কথা হুজুর! এমনি চোখে কম দেখি, এত দূর থেকে সবই তো ঝাপসা।

বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। বাইরে আবার তাঁর গলা: ঘোড়াকে খোল-বিচালি দিয়েছেন সিপাহি সাহেব—হি-হি-হি— যেন গাই-গরু, খোল খাইয়ে তুধ তুইবেন। এত চোর-ছ্যাচোড়

আপনাদের তাঁবে, বিলের চোঁচো-ঘাস কেটে এনে দিলে তো পারে। গোটা দুই লোক দেবেন কাল সকালে, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কাদা-জলের জায়গা—আমি সঙ্গে না থাকলে বাবুরা অতদূর সেই নাবাল অবধি যাবেন না।

বিরাটগড়ের নাম শুনে ভেবেছিলাম বিরাট বিপুল কোন জায়গা। ছিল তাই একদিন। বড় জমিদার তিন ঘর—এক বাড়ির তো রাজা বলে ডাক। বড় তিন ঘর বাদ দিয়ে মেজো-সেজোরাও ছিল। হাঁকডাকের অন্ত ছিল না। দুর্গাপূজার সময় পাল্লা হত, কাদের ঠাকুর কত বড়, মচ্ছবের কী কী আয়োজন কোন্ বাড়িতে।

দয়ালহরি বলেন, গাঁয়ের ভিতর একটা পাক দিয়ে আসুন—ভাঙাচুরো দালান-কোঠা আর কসাড় জঙ্গল। সাপ-শুয়োরে পাকা দালান বিনা ট্যাক্সয় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করছে। শীতকালে বড় মিঞারাও (রাত্রিবেলা কথাবার্তা হচ্ছিল। দয়ালহরি আকারে ইঙ্গিতে বাঘের কথা বুঝিয়ে দিলেন, খোলাখুলি নাম করতে ভরসা পান না) বেড়াতে আসেন। রূপকথায় রাক্ষসে-খাওয়া পাতালপুরীর গল্প আছে—অবিকল সেই কাণ্ড হুজুর, কড়মড় করে বিরাটগড় চিবিয়ে খেয়ে গেছে।

তাই। আমাদের দেশের বাড়িটা যেরকম, তেমন বাড়ি একটা-দুটো নয়, গ্রামময় ছড়ানো। মানুষজন গিসগিস করত। দিন-কাল খারাপ হয়ে পেটের ধান্দায় কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়ল। তার উপরে দাঙ্গা। অঞ্চলটা হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে পড়বে, তাই নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল অনেক দিন। বড়মানুষের অট্টালিকা যেমন ভেঙে পড়ে আছে, গরিবের পোড়ো ভিটেও তেমনি বিস্তর। দয়ালহরি বলেন, এক গোলবাড়ির ভিতরেই দশ-পনেরোটা মরে পড়ে ছিল। চাচা আপনা বাঁচা তখন, কে কার খোঁজ নেয়। দিন কতক পরে গন্ধ ছাড়তে লাগল। আমার বাড়ির একেবারে সামনাসামনি—আমার দায়টা বেশি। শেষটা

ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে দুজনে মড়ার ব্যবস্থা করলাম। ব্যবস্থা আর কী। গাঙের উপরেই তো বাড়ি, টেনেটুনে কোন গতিকে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেওয়া। যেন কালকের কথা। কী দিন সব গেছে, গ্রাম সেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। শ্মশানক্ষেত্র। আবার একটু জমে উঠছে এখন। উদ্বাস্তুরা আছে, ভাল ভাল মানুষও আসছেন বাইরে থেকে। যেমন এই হুজুর এসেছেন।

হুজুর কিন্তু পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছেন ক'টা দিনের মধ্যে। শহর থেকে এসেছি, ভালয় ভালয় শহরে গিয়ে উঠি রে বাবা! টুনুর আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি এসেছে ; তৎসহ বউদির এক টাটকা খবর—চাঁপাতলায় একটা ভাল কনে দেখে এসেছেন, হাতিবাগান তার পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না, সাক্ষাৎ পরীর অঙ্গ থেকে ডানা দুখানা কেটে দিলে যে বস্তু দাঁড়ায়। পাঁচ-দশটা দিন ছুটি মেলে না তোমার ঐ হতভাগা চাকরি থেকে ?

আমিও ভাবছি প্রায় সেইরকম। ছুটি-ছাটায় কী হবে, চাকরির পায়ে ষোলআনা দণ্ডবৎ করে উঠি গিয়ে পুনশ্চ আমাদের রোয়াকে। চাকরি অন্য কোথাও যত দিন না জোটে, ইয়ার-বন্ধু সহ যথারীতি রাজা-উজির নিধন-কর্মে লেগে যাই।

মতলবটা বউদিকে নয়, সরাসরি দাদার কাছে জানালাম। যাঁর মত না পেলে কিছু হবে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেক অসুবিধার কথা লিখলাম। কিছু কিছু বাড়িয়েও লিখলাম। দাদার ঘোরতর আপত্তি। কারখানার কেরানি হয়ে হালফিলের দুনিয়া বুঝে নিয়েছেন। গাঁয়ে পড়ে থাকলে এ বুদ্ধি খুলত না। লিখলেন, কপালগুণে সোনার চাকরি জুটে গেছে। কদাপি কোনরকমে কাজের অবহেলা না হয়। অসুবিধা হলে চেপে-চুপে থাকবে। ও-চাকরির নিয়ম—আজ এখানে কাল ওখানে—বারো ঘাটের জল খাইয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বরঞ্চ উপরওয়ালার কাছে তদ্বির কর, তড়িঘড়ি যাতে ভাল জায়গায় বদলি করে দেয়। সেই বাবদে বাজে-খরচা লাগলে পিছপাও হয়ো না।

ভাল অর্থে দাদা ভাবছেন দু-চার পয়সা উপরি আছে যেখানে। আর আমি ভাবি, আড্ডা দেবার জুত—গোনাগুনতি এই চার জন সঙ্গী এবং কালেভদ্রে কোন কোন সন্ধ্যায় নিরামিষ তাসখেলা মাত্র নয়। খেলার নামে হুল্লোড়, গানের নামে চিৎকার, তর্কের নামে ঘুষোঘুষি। কিন্তু পাহাড় নড়লেও দাদার কথা নড়বে না। তাঁর হুকুমমত রয়েছি বিরাটগড়ে পড়ে এবং উপরওয়ালার কাছে লেখালেখি করছি, বাজে-খরচা করতেও রাজি, কিন্তু কী পদ্ধতিতে কোন্ লোকের মারফতে এগুব, সঠিক জানা না থাকায় ভরসা করতে পারি নে।

হরিশ আছে। তুখোড় ছোকরা। গুণপনায় দিনকে দিন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আপিসের চাপরাসির কাজটাও তাকে দিয়েছি ইতিমধ্যে। কাপড়-জামা সাবান-কেচে রান্না সেরে জুতোয় বুরুশ ঘষে বাসন মেজে তারপর ঝাঁ করে উর্দি-চাপরাস পরে নিয়ে গোঁফ চুমরে এসে দাঁড়ায়, তখন আলাদা এক মূর্তি। বেলা দশটায় চাপরাসি সহ হাকিম সাহেব এজলাসে গিয়ে ওঠেন। এই পাড়াগাঁয়ে আরশুলাকে কেউ পাখি বলে না, কিন্তু সাব-রেজিস্ট্রারকে বলে হাকিম—দয়ালহরি একা নন, সবসুদ্ধ হুজুর-হুজুর করে। শুনতে খাসা লাগে, মেঝেয় তখন জুতো ঠুকতে ইচ্ছে করে। চারটে অবধি উঁচু মেজাজে কেটে যায় এমনি। রেজেস্ট্রি অফিসের হাকিম সাহেব।

সরকারি ডাক্তার মিশুক লোক। বয়সে প্রবীণ—আছেন অনেক কাল এখানে, সেকেলে চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারির আমল থেকে। এ-পথে এলেই রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে সাড়া নেন। বাসায় থাকলে সাইকেল থেকে নেমে এসে ওঠেন।

তামাক সাজ্ রে হরিশ। তামাকের পাট নেই বুঝি—সিগারেট! এই এক হয়েছে আপনাদের। বলবেন, হাঙ্গামা কম। আরে ভায়া, জমিয়ে বসে মউজ না হল তা নেশা কিসের শুনি? ভাত-

ভাল নয় যে খেতেই হবে। হাঙ্গামা এড়াতে চান তো ও-পাট ছেড়ে দিলেই হয়।

ভাল পসার ডাক্তারবাবুর। সকালের দিকে সরকারি ডিউটি, বাকি সময় সাইকেলের উপরেই আছেন। বয়স হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার পরে বড়-একটা বেরোন না। দূর-দূরন্তর হল তো দিনমানেও যেতে চান না। নিতান্তই যেতে হল তো ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে।

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে সিগারেট টানতে টানতে ডাক্তারবাবু বলেন, খাটনিই সার ভায়া। টাকার অঙ্কে কিছু নয়। মানুষে ছাড়ে না, তাই বেরুতে হয়। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, জল নেই। ছ্যা-ছ্যা, এ কী একটা জীবন! ছেলেটা লেখাপড়া যদি শেখে, আর যা-ই হোক, তাকে ডাক্তারি পড়তে দেব না। গিন্নি বলেন, ডাক্তার জামাইও আনা হবে না মেয়ের বিয়ে দিয়ে। সকালে একদিন সেন্টারে গিয়ে সেখানকার ভিড়টা দেখে আসবেন। আমি বুড়ো মানুষ, কম্পাউণ্ডার আরও বুড়ো হয়ে পড়েছে। সে বলে, অষুধের জল বয়ে বয়ে পারি নে, রোজ দেড়-দু কলসি লাগে।

আমি বলি, ওই জলই তো। জল ছাড়া অন্য কিছু দেন নাকি আপনারা? বিশেষ এই মফস্বল জায়গায়?

ডাক্তারবাবুও হেসে তেমনি জবাব দেন, দিই বইকি। অষুধে রঙ ধরাই তবে কেমন করে—বেগুনি, গোলাপি, লাল! মুখেও দিয়ে দেখবেন কী বিষম উৎকট। সে যা-ই হোক, খাটতে রাজি আছি ভায়া। পেটে খেলে পিঠে সয়। খাটুনির সঙ্গে সঙ্গে পকেটও ভরত যদি, তবে আর কোন দুঃখ ছিল না।

বদলি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। যোগাড়-যন্তর করে আবার চলে এলেন। নগদও নাকি ছাড়তে হয়েছিল এই ব্যাপারে। দয়ালহরির কাছে এসব শোনা। উনি নিজেও বলেন। বউ-ছেলেপুলে দেশে রেখে একলা একটি প্রাণী আছেন পড়ে। অতএব মুখেরই হা-হুতাশ—ভিতরে মজা আছে।

ডাক্তারবাবু বলেন, লোকে বলে টাকার লোভে আছি। তা নয়, মায়ায় পড়ে গেছি। এ তল্লাটে বিশ মাইল অবধি আমার নাম করে যান, বাচ্চা ছেলেটি অবধি চিনবে। সেই কোন্‌কালে ক্যাম্বেল ইস্কুলের একখানা সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিলাম, নতুন জায়গায় গিয়ে কে আমায় আমল দেবে? কাজ দেখিয়ে পসার জমাব, সে অনেক কথার কথা। থুথ্‌থুড়ে হয়ে পড়ব তদ্দিনে।

চতুর্দিক একবার তাকিয়ে নিয়ে নিশ্বাস ফেললেন সহসা: কী বলব, এই বিরাটগড় জায়গাও একেবারে নতুন ঠেকে আমার কাছে। কী জাঁকজমক দেখেছি! পুরানো কথা ছেড়ে হালফিলের ওই গোলবাড়ি ধরুন। শ্রীনগরে বড় ব্যবসা ছিল ওঁদের। কাশ্মীরে আস্তে আস্তে গোলমাল জমে আসছে। বুঝতে পারলেন, শান্তিতে ব্যবসা করা বেশি দিন আর ঘটবে না। ব্যবসা-পত্র গুটিয়ে ফেলে তখন পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠলেন। কী ধুমধাড়াক্কা চলল দিনকতক। চেহারা কী মানুষগুলোর! কিবা পুরুষ, কিবা মেয়ে। এই লম্বা গড়ন, দুধে-আলতায় মেশানো রঙ, ভ্রূ-চোখ টানা-টানা। রোজ সন্ধ্যায় আমায় যেতে হবে একটিবার। অসুখ-বিসুখ না থাকলেও যাই। অসুখ নয় বা কী করে বলি। গিন্নির বারো মাস বাতের ব্যারাম। তা ছাড়া কারও মাথা টিপ-টিপ করছে, কারও ঘুম হয় নি ভাল, কারও বা বার দুয়েক ঢেকুর উঠেছে। শরীর ভাল আছে শুনলে বড়লোকের মন-মেজাজ বিগড়ে যায়—ভাবে, ডাক্তার যত্ন করে দেখছে না। আমার কী—যাকে যা বললে খুশি হবে, তাই বলি। খাওয়াটা এক বেলা ওখানে—রাতে কোনদিন বাসায় খেতে হয় না। মাস-মাইনে দু'শ টাকা। পয়লা তারিখে দুখানা এক-শ টাকার নোট খামে করে এনে দিয়ে যায়। মেজাজি বড়লোক। চোখের উপরে সমস্ত শেষ হয়ে গেল। আর এখন গাঁয়ে এসে জুটেছে দেখুন না—লোক নয় তো পোক, পোকার মতন কিলবিল করে। ঘরবাড়ি টাকাপয়সা ফেলে উদ্বাস্তু হয়ে রাজ্যের রোগ-পীড়েগুলোই কেবল সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কথার মধ্যে হঠাৎ ডাক্তারবাবু তড়াক করে উঠে পড়লেন।

বসবার জো আছে ভায়া। জেলেপাড়ায় খাবি খাচ্ছে একটা। ভুলে গিয়েছিলাম। হয়তো বা টেঁসে গেছে এতক্ষণে। মড়ি-বাঁধার উয্যুগ করছে। খালি পকেটে অঞ্চলময় এখন ডন কষে বেড়ানো।

সাইকেলের বেল বাজিয়ে সাঁ-সাঁ করে ডাক্তারবাবু ছুটলেন।

সন্ধ্যাবেলা থানায় ডাক পড়ে প্রায়ই। হ্যারিকেন ও লাঠি-বন্দুক নিয়ে কনস্টেবল চলে আসে। ছোট দারোগার বিষম তাসের নেশা—কাজের দায়ে বাইরে গেলে অবশ্য হয়ে ওঠে না—থানায় উপস্থিত থাকলে তাসে তাঁরা বসবেনই। ডাক্তারবাবু যান—ডাক্তারবাবু ছোট দারোগা বড় দারোগা তিনজন তো আছেনই, এবং আমি অথবা দয়ালহরি। দয়ালহরির অন্য দশটা কাজে যেমন, খেলার ব্যাপারেও তাই। হুকুমের মাত্র অপেক্ষা। আমায় পেলে তাঁকে আর বসতে হয় না। হাকিম হাজির থাকতে ভেণ্ডারকে কে ডাকে ? তাসখেলার ব্যাপারেও পাড়ার মধ্যে আমার নাম ছিল—এখানে আনাড়িদের মধ্যে তো শাহান-শা সম্রাট।

চিরকেলে আড্ডাবাজ মানুষ আমি ; কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন বিতৃষ্ণা ধরে আসছে। এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে কনস্টেবলদের ফিরিয়ে দিই অনেক দিন। খেলার ঝোঁক ছোট দারোগার যতই থাক্, আদপে তিনি খেলতে জানেন না। এবং অঞ্চলটার অধি-পতিস্বরূপ নিজেদের বিবেচনা করে খেলার ভিতর ক্ষণে ক্ষণে মেজাজ দেখান। আমার বরদাস্ত হয় না। একদিন তার চরম দেখতে পেলাম। পাশের এক গাঁয়ে বৈশাখ মাস ধরে মেলা বসে, গ্রাম্য ছুতোরের গড়া অনেক রকম কাঠের জিনিস আমদানি হয় সেখানে। হরিশকে নিয়ে একদিন সেখানে গিয়ে একগাদা কাঠের খেলনা কিনলাম টুনুবাবুর জন্য। পুজোয় বাড়ি যাব, খেলনা পেয়ে সে আহ্লাদে নৃত্য করবে।

ফিরে আসছি, রাত হয়ে গেছে খানিকটা, থানার কাছে এসে কানে এল ছোটবাবু বিষম ক্রোধে কার উপর গর্জাচ্ছেন। হরিশকে বাসায় যেতে বলে আমি ঢুকে পড়লাম। ও হরি, তাস খেলার ব্যাপার! চটেন ছোটবাবু, কিন্তু এত উত্তেজনা দেখি নি কোনদিন। হোড় মশায় তাঁর পার্টনার। খুন, না চুরি-ডাকাতি করেছেন—ঠিক তেমনিভাবে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, চোখ ছলছল করছে তাঁর। আমতা-আমতা করে কী একটু বলতে গেলেন, ছোটবাবু তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে বুড়ো মানুষটার টুঁটি চেপে ধরলেন। বাঘে যেমন হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি হতভম্ব, এরকম ব্যাপার ধারণায় আসে না। শীর্ণ দয়ালহরি থরথর কাঁপছেন। এমন আর হবে না হুজুর, এই ধরনের বলতে যাচ্ছেন কিছু। কিন্তু ছোটবাবুর তাড়ায় বক্তব্য আটকে যায়। আমি গিয়ে পড়েছিলাম ভাগ্যিস, নয়তো শুধু গলা চেপে ধরায় বোধহয় শেষ হত না, কিলটা ঘুষিটা হত। আমায় দেখে দয়াল-হরিকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা নরম হয়ে ছোটবাবু নিজ স্থানে বসলেন: চিঁড়ে-হরতন ক'টা রঙই কেবল চিনে রেখেছেন হোড় মশায়? যাক গে, বেঁচে গেলেন। খেলুড়ে মানুষ এসে গেছেন। কাজকর্ম থাকে তো বেরিয়ে পড়ুন—চলে যান।

এই কাণ্ডের পরেও খেলায় বসতে বলে। মানুষকে কী ভাবে ওরা? ডাক্তারবাবু বলেন, দাঁড়িয়ে কী ভাবেন? বসুন।

কেন?

বড় দারোগা বলেন, হোড়ের হাত নিয়ে বসে যান। বড্ড জমেছে। স্লামে স্লামে আমাদের ছয়লাপ। হেরে গিয়ে ছোটবাবু অত ক্ষেপেছেন।

আমি বললাম, দেখছি তাই। কিন্তু আরও হেরে গিয়ে আমার উপরেও যদি হামলা দেন! তখন তো ব্যাপার একতরফা হবে না।

বড় দারোগা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: হোড় আর আপনি! ছি-ছি, এমন কথা বললেন কী করে?

মাপ করবেন, খেলবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না আমার—

বলে গটমট করে নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এলাম। পরদিন অফিসে ঢুকতে দেখলাম, হোড় মশায় মক্কেলপরিবৃত হয়ে খসখস করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। হাকিম এসে যাওয়ায় চারিদিকে তটস্থ ভাব—তাঁর নিচু ঘাড় উঁচু হয়ে উঠল না। আমার জুতোর আওয়াজ একেবারেই কানে যায় নি, এটা মনে হয় না। লজ্জা —কী লাঞ্ছনাই হল তুচ্ছ তাসখেলা নিয়ে! লজ্জা আমারও। অন্য দিন দাঁড়াই, কাজকর্মের ভিড় কেমন হবে আন্দাজ নিই, দু-চারটে কথাও বলি এর-ওর সঙ্গে। আজকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকে মোটাসোটা এক আইনের বই খুলে বসলাম।

ক'দিন কাটল। আর যাই নে থানায়। কনস্টেবল যথারীতি ডাকতে আসে। এসে ফিরে যায়। একদিন—পরে শুনলাম দয়ালহরিকে পাওয়া যায় নি, কোন মক্কেলের বাড়ি নিমন্ত্রণে খেতে গিয়েছিলেন—আমি যাব না বললেও কনস্টেবল নড়ে না। নিয়েই যাবে। আমারও তখন মেজাজ বিগড়ে যায়ঃ খুনি আসামী নাকি, ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছ? বেরিয়ে যাও বলছি উঠোন থেকে।

কনস্টেবল ফিরে গিয়ে কী বলেছে জানি নে, পরদিন ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত।

হল কী ভায়া, খেলাটেলা বন্ধ করে দিলেন?

আর যাব না ডাক্তারবাবু।

কেন, ঘরে বসে কী করবেন?

সেদিন ওই কাণ্ড হয়ে গেল, আপনার চোখের উপরেই তো হল, তারপরে কী করে যাওয়া চলে বলুন?

ডাক্তারবাবু অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলেন, কী হল সেদিন?

ছোট দারোগা ভদ্রলোককে অমনভাবে অপমান করলেন। কী আশ্চর্য, কিছুই আপনার মনে পড়ছে না?

ডাক্তার বললেন, রসুন রসুন। দয়ালহরির গলা চেপে ধরেছিল, তাই বোধহয় বলছেন? কিন্তু অপমান হবে কেন?

অপমান কিসে হয় তা হলে?

আমার আপনার অপমান হতে পারে। অতখানি লাগেও না। কিন্তু টৌর্নি মানুষ, মোসাহেবি করে বেড়ায়—ওদের চামড়া মোটা, গায়ে লাগে না। আপনি তো রেগেমেগে চলে এলেন। তখন আবার সেই আসরেই হোড় মশায় বসে গেল।

টৌর্নি কথাটার সঙ্গে পরিচয় এখানে এসে। মক্কেলের হয়ে তদ্বির-তদারক করে, কাজ হাসিলের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার নেই। এই হল টৌর্নির ব্যবসা। যাদের হাতে কাজ আছে, খাতির রেখে চলতে হয় সেইসব লোকের সঙ্গে। মাথার লোকের সঙ্গে খাতির আছে বুঝলে তবেই মক্কেল জমে।

ডাক্তারবাবু বলছেন, সেই দিন খেলেছে, রোজই খেলে। আপনি যান না, কিন্তু খেলা একটা দিনও বন্ধ নেই। কম বয়স আপনার, তাই মাথা গরম করেন। অকারণে চটিয়ে দিলেন ছোটবাবুকে। বাইরের ক'টি প্রাণী আমরা এখানে। দায়ে-বেদায়ে পরস্পরকে কাজে লাগে। নিজেদের মধ্যে মন-ভাঙাভাঙি হওয়া ঠিক নয়।

ডাক্তারবাবুর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। অফিস-ফেরতা সেদিন দয়ালহরিকে ডেকে এলাম: যাবেন আমার ওখানে একবার।

যে আজ্ঞে।—বলে মাথা কাত করলেন। এবং যথাকালে এসে উপস্থিত। সোজা রেজেস্ট্রি অফিস থেকে চলে আসেন নি। শুধু হাতেও নয়—শুধু হাতে আসেন কালে-ভদ্রে কদাচিৎ—হাতে একটা লাউ। লাউ নামিয়ে রেখে—ঐ তো লম্বা মানুষ, ঘাড় বাঁকিয়ে প্রায় গোলাকার হয়ে নমস্কার সেরে বললেন, গাছের লাউ হুজুর।

এসব কেন আনেন? হরিশ মুসুরিডালই পারে না, তার লাউ রাঁধবে!

তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন : শুনলাম তাস খেলতে যান আপনি থানায় ?

দু-পাটি দন্ত বিকশিত করে দয়ালহরি বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—

সেদিনের ওই কাণ্ডের পরেও ?

দোষ আমারই ছিল। ছোটবাবু চোখ টিপছেন টেক্কা মারবার জন্য, আমি নজর করে দেখি নি। চোখের দৃষ্টি ভাল নেই, সব সময় সব জিনিস নজরে আসে না।

তাই টুঁটি ধরবেন একজন ভদ্রলোকের ?

এই কথায় ভদ্রলোক গদগদ হয়ে উঠলেন : দেখুন তাই। আপনি মহৎ বলে বুঝেছেন ব্যাপারটা। ভদ্রলোক তো কতই থাকে, বিশেষ মানী লোক আমরা এদিগরের। উপাধি আমাদের হোড়-রায়, লম্বা হয়ে যায় বলে রায়টা আর লিখি নে। ছোটবাবুর গায়ে যেন অসুরের বল, দম আটকে অক্কা পেতাম আর-একটু হলে। রাতে ঘাড় ফেরাতে পারি নে। বড় বউয়ের হাঁপানির টান, সে উঠতে পারল না তো নিজের হাতে সারা রাত তারপিন মালিশ করি। দু-তিন দিন মালিশের পর ব্যথাটা গেল। সেই থেকে খুব নজর রেখে খেলি হুজুর। আর কখনও অমনধারা হবে না।

তারপর সকাতরে বলেন, হুজুর যাচ্ছেন না কেন ? হুজুর গেলে তো আমার খেলা মাপ হয়ে যায়।

এই মানুষের জন্য চটে রয়েছি আমি, এই নিয়ে ঘোঁট পাকাতে যাচ্ছিলাম ? পরের দিন তেল মেখে স্নানে যাচ্ছি তখন আর এক মজা। রাধানাথ হঠাৎ আমার বাসায়। রাধানাথও রেজেস্ট্রি অফিসের দলিল-লেখক, বয়স কম, অল্প দিন এই কাজে এসেছে, মক্কেল জোটাতে পারে নি এখনও সে রকম। রাধানাথও লাউ এনেছে—একটা নয়, দু হাতে দুটো।

কী চাই ?

হুজুর লাউ ভালবাসেন।

কে বলল ?

আজ্ঞে—থতমত খেয়ে সে চুপ করে যায়।

চটে গিয়ে বলি, কোথায় পেলেন এ সব আজব কথা? লাউ আমি খাই নে, হরিশও রাঁধতে জানে না।

লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি পুকুরঘাটে নেমে যাই। স্নান সেরে এসে দেখি, রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে হরিশের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। আমায় দেখে সুড়সুড় করে সরে পড়ল।

হরিশকে বললাম, কালকের লাউ পড়ে আছে, আবার লাউ রাখতে গেলি কেন?

এক গাঁয়ের মানুষ। ফেরত দিলে আমারই উপর রাগ করবে। বলবে, সরকারি কাজ পেয়ে বেটার দেমাক হয়েছে। তার চেয়ে কুচি কুচি করে কেটে গরুর মুখে ধরব। ভগবতী খেয়ে নেবেন, পুণ্যি হবে।

হঠাৎ এত লাউ আসতে লাগল কেন বল্ দিকি?

দুটি প্রাণী এক বাসায় বসবাস করি—চাপরাসি হলেও হরিশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফিক ফিক করে সে হাসতে লাগল। বলে, এ আর কী দেখছেন? রটনা হয়ে গেছে, লাউ এখন ঝাঁকা ঝাঁকা আসবে। কাল হোড় মশায় এলেন, রাধানাথ তখন রাস্তার উপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে। আরও সব নিশ্চয় এদিকে ওদিকে ছিল। না দেখলেই বা কী? হোড় মশায়ই তো জাঁক করে সকলকে বলে বেড়ান। থানার দারোগারা চোখে হারান ওঁকে, রেজেস্ট্রি অফিসের হাকিম হামেশাই বাসায় ডেকে পাঠান। দেখেও তাই সকলে। তারাও অমনি হোড় মশায়ের মতন খাতির জমাতে চায়।

এখন মনে পড়ছে। কাল যখন দয়ালহরিকে বাসায় আসতে বললাম, 'যে আজ্ঞে' বলে চতুর্দিকে উনি দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তাই বটে। হরিশের কাছে শুনে মানেটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

কনস্টেবল ডাকতে আসে না। আর কেন, নিজেই চলে গেলাম থানায়। রচনাশক্তি আছে আমার বেশ—এতদিন না আসার

একটা লাগসই কৈফিয়ত খাড়া করলাম। ওঁদেরও লোকাভাব। ছোটবাবুর মনে রাগ থাকলেও দু-চারটে মিষ্টি কথায় সমস্ত মিটে গেল। খেলাটা ভাল জমল সেদিন। খেলা ভেঙে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি।

অভাবে মানুষ কী হয়ে যায়, এই দয়ালহরির বেলা দেখুন। এত মোসাহেবিও পারে মানুষে। বিশেষ অমনি এক ঘটনা হয়ে যাবার পর।

ডাক্তারবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, যার যে ব্যবসা। মেথর যদি শুচিবেয়ে হয়ে যায় যে ময়লা ঘাঁটবে না, কিংবা আমি ডাক্তার যদি বলি যে মড়া ছুঁতে পারব না, তবে তো ভাত জুটবে না পেটে। আপনার হাকিমি চাকরি—হ্যাঁ, মান টেনে বেড়াতে পারেন স্বচ্ছন্দে। হোড় মশায়দের গলাধাক্কা দিন, তবু দেখবেন ছিনে-জোঁকের মতন গা লেপটে বেড়াচ্ছে—মক্কেলদের দেখিয়ে দেখিয়ে। কী, না খাতিরটা দেখে নাও হুজুরের কাছে। হুজুরকে দিচ্ছি বলে আজেবাজে কত পয়সা ফাঁকি দিয়ে নেয় সে যদি খবর রাখেন!

কী সাংঘাতিক! তবে তো সামাল হতে হয় এদের কাছ থেকে!

সামলাবেন ক'জনকে ভায়া? কাজেকর্মে লাগেও তো মানুষ-জন। যার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, সে-ই সুযোগ নেবে। ও ঠেকাবার জো নেই। আপনি নতুন মানুষ বলেই বলছি, চোখ নিচু করে তাকাবেন না ওসব দিকে। আপনি করে খাচ্ছেন, যার যেমন পথ—তাদেরও নিজের কায়দায় করে খেতে দিন।

যাচ্ছি আবার তাসের আড্ডায়। আর কিছু দৃক্‌পাত করি নে। তবে নিয়মিতভাবে নয়। একদিন যাই তো দু-দিন যাই নে। যোগাযোগটা আছে এই মাত্র। না যাওয়ার ভিন্ন কারণও ঘটেছে। গোপনে বলি, খবরদার চাউর করে দেবেন না। গানের গলা আছে, সে তো জানেন। পাড়ার সরস্বতী-পূজোয় বছর বছর গান

লিখবারও দায় ছিল আমার। সেই রোগটা অধিক প্রকট হয়েছে এখানে। পাঁচ-সাত লাইনে গান বাঁধা হয়ে যেত, সেই বস্তু এখন পাঁচ-সাত পাতা জোড়া পদ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। বয়সটা খারাপ, কাজকর্ম সামান্যই এবং চতুর্দিকে গাঙ-খাল ও সবুজ গাছপালা। পদ্যের আয়তন দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। আড্ডায় না গিয়ে নিরিবিলি খাতাপত্র নিয়ে বসি। তিন-চারটে খাতা ভরাট হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

মাস কয়েক কাটল। বিরাটগড় বেশ গা-সওয়া হয়েছে। বদলির জন্য তেমন ছটফটানি নেই। দিনমানে মন্দ লাগে না। হাকিমরূপে খানিকটা সময় সমারোহে অফিসে কাটে। কোন বড় জায়গা হলে—নতুন মানুষ আমি—কারও না কারও অধীনে কাজ করতে হত। এখানে একেশ্বর। পদ্য জমে উঠল তো গেলাম অফিসে একটা-দুটোয়। দলিল জমা দিয়ে লোকগুলো তীর্থকাকের মত বসে আছে। দেরি হোক যা-ই হোক, মোটের উপর এসে গেছি, তাতেই এরা কৃতার্থ। এ নিয়ে সদরে কেউ লেখালেখি করতে যাবে না, সে প্রশ্ন মনেও আসে না কারও।

অফিসের পরে নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করি খানিকটা—এই অভ্যাস করে নিয়েছি। পরিত্যক্ত কোন ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম হয়তো কোনদিন। শিয়াল ঘুরছে কী যেন শুঁকে শুঁকে, মানুষ দেখে বাড়ির ভিতর ঘন জঙ্গলের দিকে পালাল। কত উৎসব-সমারোহ হত, কত মানুষের হৈ-চৈ—আজকে দেখুন সেই জায়গার দশা। মনটা উদাস হয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে তার পরে হয়তো গেলাম থানায়, আড্ডা দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে এলাম। অথবা বাসায় এসে হ্যারিকেন জ্বেলে বসে পড়লাম। হরিশকে চা আনতে বলি কিংবা কাছে ডেকে এনে এ-গল্প সে-গল্প করি তার সঙ্গে।

এ পর্যন্ত এক রকম কাটে। কিন্তু মুশকিল আরও পরে, রাত্রি

গভীর হয়ে উঠলে। যেন ভিন্ন জগৎ। কলকাতা শহরে দিনে রাতে তফাত বড় নেই। আস্থা করা যায়, হ্যাঁ, একই জায়গা বটে, রাস্তা ঘরবাড়ি মানুষ-জন এক। কিন্তু বিরাটগড় দিনমানের চেহারা বদলে ফেলে ভিন্ন রকম হয়ে গেছে রাত্রে। দিনের লোক যারা, ঘরে ঘরে তারা সব খিল এঁটে দিয়েছে। নতুন একদল বেরিয়েছে। এসেছে ভাঙা অট্টালিকার অন্ধিসন্ধি থেকে, গাছের ঘনপত্রের ভিতর থেকে, নানান অলক্ষ্য অগোচর জায়গা থেকে। কোনখানে সারাদিন অন্ধকারের সঙ্গে লেপটে থাকে, সময় বুঝে বেরিয়ে পড়ে সবসুদ্ধ। তোলপাড় লাগিয়ে দেয়। তক্ষক ডাকে ঘরের আড়ায়। ফেউ ডাকে জঙ্গলে—তার মানে বড়মিঞা কিংবা ওই-জাতীয় বড়দের কেউ দর্শন দিয়েছেন। বাদুড়ের ঝাঁক কিচিরমিচির করে দেবদারুর পাকা ফল খায়, গাছের উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আম-কাঁঠালের বাগিচা বাসাবাড়ির প্রায় চতুর্দিকে। পুরানো বাগান, অতিকায় গাছপালা। মাথায় মাথায় আঁটা—যেন জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ-সুয্যি এলাকার মধ্যে উঁকি দিতে দেবে না। পাঁজি দেখে বলতে হবে, তিথিটা অমাবস্যা না পূর্ণিমা —চোখে দেখে ধরবার জো নেই। গা সিরসির করে—এই বুঝি সাপ এসে ঢুকল বেড়ার ছিদ্রপথে, বাঘ বুঝি হামলা দিয়ে পড়ে বেড়ার উপর! কবি নিশিরাত্রে দার্শনিক হয়ে যান—কাজ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে মানুষে মানুষে তফাত হয়ে থাকা একান্ত অনুচিত, এই মহাতত্ত্ব মনে পড়ে যায়। দাওয়ার এক দিকে হরিশ ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়া দিয়ে নিয়েছে, সেই জায়গা থেকে তাকে ঘরের ভিতরে ডেকে নিই। হাকিম ও চাপরাসির পাশাপাশি শয্যা। দশেধর্মে দেখে না এই যা—দেখতে পেলে আমার এই ঔদার্যে ধন্য ধন্য করত।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে হরিশ ডাকছে, উঠে পড়ুন হুজুর, উঠুন। বেড়ার ওদিকে জলের তোড় শোনা যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম।

সর্বনাশ, এত জল। উঠানে স্রোত বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলেছে আজ দু'দিন ধরে। কিন্তু বিকাল থেকে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ। তখন তো এত জল দেখা যায় নি।

এদিক-ওদিক তাকাই। জলের সমুদ্র। মেঘভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অফিস-বাড়ি দ্বীপের মত দেখায়। উঁচু পোতার উপর বাড়ি, জিওলের ডাল পুঁতে কাঁটাতারে ঘেরা চারিদিক। বেড়ার নীচে জলের ধাক্কা দিচ্ছে, এখানে এই দাওয়া থেকেই নজরে আসছে। দাওয়ায় বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। ভারি এক আফালি করল। হরিশ চুকচুক করেঃ ইস, একেবারে ছাঁচতলায় গো। মস্ত বড় কাতলা। পুকুর-টুকুর সব ভেসে গিয়ে মাছ বেরিয়ে পড়ল। খেপলা-জাল পেলে এক্ষুনি ওটাকে কায়দা করতাম।

বান ডেকেছে। সকালের আলো ফুটলে লটবহর নিয়ে এক-হাঁটু জল ভেঙে রেজেষ্ট্রি অফিসের দালানে উঠলাম। এসেছিলাম ভাগ্যিস। বানের তোড়ে সন্ধ্যাবেলা কাঁচা বাসাবাড়ি ভেঙে পড়ল। ভাঙা চাল, খুঁটি বেড়া এদিক-সেদিক ভেসে চলেছে। ওইখানে থেকে গেলে আমাদেরও বোধহয় অমনি ভাসতে হত।

যদি বলি, মজাও পাচ্ছি আমি—অবিশ্বাস করবেন না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কলকাতায় লিখি-লিখি করেও এ ব্যাপারের কিছু জানালাম না। কী হবে—দাদা-বউদি ব্যস্ত হবেন মিছিমিছি। বন্যা এ তল্লাটে নতুন নয়, বন্যার ভয়ে কে কবে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে ? যাই বলুন, শহরের কোন এক বড় অফিসের কেরানি হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল এখানে। মুক্তি আছে। দাদাকে লিখে দিলাম, বৃষ্টি-বাদলা বড্ড হচ্ছে, পথঘাট ভেসে গেছে। এবং দাদারও জবাব আসবে জানিঃ সাবধানে থেকো, কুইনাইন খেয়ো রোজ দু-বড়ি করে—সকালে একটা সন্ধ্যায় একটা, জল না ফুটিয়ে খেয়ো না, ইত্যাদি।

দিন চারেক পরে জল সরে গিয়ে ফের ডাঙা দেখা গেল। তখন ঘরের সমস্যা। সরকারি অফিসের মধ্যে চিরদিন বসবাস চলে না।

জায়গাই বা কোথা? ভেণ্ডারদের সেরেস্তার পাশে একটু ঢাকা বারান্দা। দেয়ালটা বেড়ায় ঘিরে পোস্টাফিস বসিয়েছে। নতুন বাঁশ-খুঁটি দিয়ে আবার ওইরকম খোড়ো-ঘর তুলে দেবে, সেখানে পুনশ্চ গিয়ে উঠব, তাতে আমার ঘোর আপত্তি। বৃষ্টি-বাদলা চলল তো এখন—আশ্বিনের ঝড়-বাতাসের বড় মরশুম সামনে। এবার হরিশ ডেকে তুলেছিল—এমন হতে পারে, দুজনের কেউ আমরা টের পেলাম না, ঝপাস করে ছাউনিসুদ্ধ চাল ভেঙে ঘাড়ের উপর পড়ল। চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় সে ভী আচ্ছা—পাকা জায়গা ছাড়া থাকছি নে। ডাক্তারবাবু ও দারোগাদ্বয়ও চিন্তিত হয়েছেন—তাই তো কী করা যায়! একসঙ্গে বেশ থাকা যাচ্ছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাকরি জোটানও সোজা নয় আজকাল। কিন্তু চিন্তা ও আলোচনায় কোন্ সুরাহা হতে পারে—দালানকোঠার বাসাবাড়ি কে বানিয়ে দিচ্ছে সাব-রেজিস্ট্রার হাকিমের জন্যে?

তারপরে বড় দারোগাবাবুরই খেয়াল হল কথাটা। হোড় মশায়কে বললেন, গোলবাড়িতে দাও না হে ব্যবস্থা করে। মাখন মিত্তির ক'টা ঘর মেরামত করে নিয়েছিল—সে যখন আসছে না, মিত্তিরকে লিখে চাবি আনিয়ে ঘর খুলে দাও। আমার আর ডাক্তারবাবুর নাম করে লেখ, আপত্তি করবে না।

হোড় মশায় প্রস্তাবে তেমন গা করেন না। মিনমিন করে বললেন, তা হলে তো ভালই হয়। চাবির জন্যে আটকাচ্ছে না, আমার কাছেও চাবি ছিল একসেট, খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু উনি কি থাকতে পারবেন?

আমি বললাম, ঘরবাড়ি বাইরে থেকে তো ভালই মনে হল। অসুবিধে কী?

হোড় মশায় বলেন, মিত্তির ওই মানুষ। এসেও ছিল থাকবে বলে। সে কিন্তু থাকতে পারে নি। এক দিনে বাপ-বাপ করে পালাল।

বড় দারোগা টেবিল চাপড়ে বললেন, কুছ পরোয়া নেই। মাখন

মিত্তির আর আপনি। বন্ধুলোক আপনি, সরকারি লোকও বটেন। কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব বাড়ির সামনে। সারা রাত্তির পাহারা দেবে। কোন রকম উৎপাত হবে না। কী আশ্চর্য, আকাশ-পাতাল ভেবে মরছি—গোলবাড়ির কথা কেন যে মনে পড়ে নি—

হোড় মশায়ের দ্বিধা তবু ঘোচে না: তা বেশ তো চাবি-ছোড়ান পাওয়া যাবে। হুকুম হলেই তালা খুলে দেব। ঘরও খাসা। রাঙা মেঝে, রঙ-করা দেয়াল, মিত্তিরের শখ-করে-কেনা আসবাব-পত্তর—সরকারি পাকা-বাসা যদ্দিন না বানিয়ে দিচ্ছে স্বচ্ছন্দে ভোগ-দখল করুন গে ওইসব। কথা হল, কনস্টেবলের ব্যাপার নয় —একটা কেন, এক গণ্ডা মোতায়েন করলেও কিছু করতে পারবে না। কনস্টেবল চোর-ডাকাত সামলাতে পারে, ওঁদের উপর কোন্ এক্তিয়ার আছে বলুন?

গোলবাড়ি ও মাখন মিত্তিরের ব্যাপার আগে কিছু শুনেছি, আরও বিশদভাবে শোনা গেল। গ্রামের এক পাশে নদীর কাছা-কাছি সেকেলে বাড়ি। চকমিলান—অর্থাৎ উঠান ঘিরে চারি-দিকেই দালান-কোঠা। দোতলা। সদরে ছিল সিংদরজা—গুল-পেরেক বসান প্রকাণ্ড কপাট, এমন শক্ত যে, কুড়াল মারলে ফিরে আসে। অত বড় বাড়ি, ঢোকবার সেই একমাত্র পথ। খিড়কির বাগানে যাবার আর-একটা ছোট্ট দরজা পিছন দিকে, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানের চারিদিক, বাইরে থেকে বাগানে ঢোকা যায় না। দেয়াল পাকা দু-হাত আড়াই হাত চওড়া—জানলা নয়, ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ডাকাতে হানা দিয়ে এ-বাড়ির কিছু করতে পারবে না। ইয়োরোপে যেমন ক্যাস্‌ল বানাত সেকালে।

কতকটা ক্যাস্‌লের মতই সামনের ঘরটা গোলাকার। গোল গোল থাম। এত উঁচু এমন গোলঘর-ওয়ালা বাড়ি এ তল্লাটে আর নেই। নৌকোয় যেতে যেতে এক বাঁক আগে থেকে লোকে গোল-

বাড়ি দেখায়। বিরাটগড় গাঁয়ের নিশানা। কোন্ চৌধুরি নবাব-সরকারে কাজ করতেন, তাঁর এই বসতবাড়ি। হাঁকডাকের অন্ত ছিল না, হাতে মাথা কাটতেন তাঁরা নাকি সে আমলে।

নবাবি আমল গিয়ে কোম্পানির আমল—তখন আর-এক যুগ। তালুক-মুলুক একের পর এক লাটে উঠে চৌধুরিদের অবস্থা একেবারে পড়ে গেল। গ্রাম ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন অনেক দূরে কোথায়। শোনা যায় পেশোয়ার, তারপরে কাশ্মীর। সেইখানে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

মোটরগাড়ি ও মোটরের কলকজা আমদানি বাইরে থেকে। প্রায় একচেটিয়া কারবার—লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন আবার। দু-হাতে রোজগার। কিন্তু বিরাটগড় গ্রামের লোকের কী—রূপকথার মত গল্প শোনে তারা। অবাস্তব এক ব্যাপার, সত্যি যে গ্রামের কেউ এমন আছেন, বিশ্বাস করে না। গোলবাড়ির সিংদরজায় মস্ত বড় তালা, বাড়ির উঠানে একহাঁটু জঙ্গল। চৈত্র মাসে চৌধুরিদের কোন কর্মচারী এসে তালা খুলতেন। ঘরদোরে ঝাঁট-পাট পড়ত। সাল-তামামি খাজনা মিটিয়ে দিয়ে আসতেন কাছারি গিয়ে। বছরের ভিতর সেই মাত্র পাঁচ-সাতটা দিন—তারপরে আবার তালা ঝুলত যেমন-কে-তেমন। জঙ্গল এঁটে থাকত।

কিন্তু এই সেবারে কাশ্মীরে মহারাজার সঙ্গে বড় গোলমালের সময়টা চৌধুরিরা সবশুদ্ধ হুড়মুড় করে এসে পড়লেন। অনেক মানুষ, অগণ্য চাকর-বাকর। সকলের আগে এল মাখন মিস্তির। গাঁয়ের ভিতর প্রথম এই মাখন মিস্তিরের উদয়। গোলবাড়ির সঙ্গে মাখনের কোন্ সম্পর্ক সঠিক জানবার উপায় নেই। ধবধবে রঙ বলে বড়-চৌধুরিকে সবাই বলত সাহেব-কর্তা। মাখন নাকি তাঁর ভাগনি-জামাই—ভাগনি মরে যাবার পর বিয়ে-থাওয়া করে নি, মামাশ্বশুরদের কাজ-কারবার দেখে। আবার কেউ বলে, শুধু মাত্র ম্যানেজার, মাইনে-খাওয়া লোক, অতিশয় করিতকর্মা বলে কর্তার

কাছে অমন খাতির। মোটের উপর দেখা গেল, সর্ব ব্যাপারে মাখনের অখণ্ড কর্তৃত্ব। শ্রীনগরের কারবারেও নাকি সে ছিল সর্বেসর্বা—সাহেব-কর্তাকে যা বলত, চোখ বুজে তিনি তাই মেনে নিতেন। কর্তাদের পৈতৃক গাঁয়ে-ঘরে ফেরার মতলব হল, মাখনই আগে এসে সকল রকম ব্যবস্থা করে। বিস্তর লোক লাগিয়ে চারিদিক সাফ-সাফাই করল, কলি ফেরাল আগাগোড়া, ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মেঝে বানাল। কাজেকর্মে লোকজনের ব্যস্ততায় বাড়ি সরগরম। আর দয়ালহরি হোড় জুটে গেছেন তার মধ্যে। বিশেষ মানুষ যে-কেউ গাঁয়ে আসবে, দয়ালহরি আগবাড়িয়ে পড়ে খাটা-খাটনি করেন। তাঁর স্বভাব এই। গোলবাড়ির ব্যাপারেও অন্যথা হল না। মাখন মিত্তিরের ডান হাত হয়ে পড়লেন তিনি অচিরে।

কাশ্মীরের কাজ-কারবার পাকাপাকি গুটিয়ে চলে এসেছেন, চতুর্দিকে এই রটনা। সেখানে থাকতে ভরসা করা যায় না। কারবার গুটিয়ে নাকি অঢেল টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছেন। বাংলা দেশে নতুন একটা-কিছু জমিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত গাঁয়ে থাকবেন। চেষ্টা-চরিত্র চলছে ভিতরে ভিতরে।

কিন্তু সাহেব-কর্তা তা বলেন না। মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছেন। নিজের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, উপরন্তু ভাগনি একটি। সেই অত দূরে পাহাড়ের ঘেরের ভিতর বাঙালী পাবেন কোথা? চিঠিপত্রের মারফতে এ সমস্ত হয় না। বিয়ে দিতে এসেছেন, শুভকর্ম চুকিয়ে ফিরে চলে যাবেন। কী চেহারা—তিনটি মেয়েরই। গোলাপ ফুলের রঙ। মোম-মাজা নিটোল শরীরে রূপ যেন গড়িয়ে পড়ে। ঘন কালো চুল, ঝকমকে চোখ। যেখানে যেমনটি হলে মানায়। বিধাতাপুরুষ যেন বাটালি ধরে গড়ে তুলেছেন। সৃষ্টির গোড়া থেকে এই কাজ করে করে হাত পেকে গেছে। বুড়ো বয়সে তাই ঝোঁক হল, যত গুণপনা আছে সমস্ত খাটিয়ে নিখুঁত করে গড়বেন তিনটে মেয়ে। সেই ওরা তিন জন। শুধু মাত্র

চেহারাই নয়, হাসি কথাবার্তা ছুটোছুটি তা-ও ওদের রূপের মধ্যে।

এমন সব মেয়ের বরের ভাবনা কী। তার উপরে টাকা ঢালবেন। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল। সাহেব-কর্তার মেয়ে সকলের বড়, তার বিয়ের তারিখ সকলের আগে। এমনি সময় অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। এই অঞ্চলটা কেউ বলে পাকিস্তানে পড়বে, কেউ বলে হিন্দুস্থানে। নানা রকম গুজব উঠছে প্রতিদিন। চিরকালের পড়শি—হেসে ছাড়া কথা কইত না, তারাই সব কী রকম হয়ে গেছে, ছোরায় শান দিয়ে রাখছে। গোলবাড়ির বিরাট আয়োজন—কিন্তু গতিক দেখে উৎসবের মজা মাথায় উঠল। পালাতে পারলে আর কিছু চান না। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করা হয়ে গেছে। কিন্তু বড় মুশকিল সোমত্ত মেয়েগুলো নিয়ে। গোটা জেলা জুড়ে তাদের রূপের খ্যাতি। নদী-খালের দেশ, নৌকো ছাড়া গতি নেই, পথের উপর যে গ্রামগুলো পড়বে, সেইখানে গোলমালটা বেশি। কেমন করে কোন্ কৌশলে সকলকে নিয়ে বের করা যায়? বিরাটগড়ে চকমিলান বাড়ির মধ্যে দুয়োর এঁটে তবু যা হোক আছেন, এই অবস্থায় ফাঁকা নদীর উপর বেরুনো আর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া এক কথা।

তবে মাখন মিত্তির একটুও দমে নি। গোটা অঞ্চল সমভূম হয়ে গেলেও গোলবাড়ির পলস্তারা এক ইঞ্চি খসবে না। জীবন দিয়ে রুখবে সে। ক'দিন খুব ছুটোছুটি করে মাতব্বরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এল। টাকা ছাড়তে হবে। বিয়ে এইখানেই—কোন রকম চিন্তার হেতু নেই। টাকা পেলে ওই মাতব্বররা যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেবে। একদল জোয়ান পুরুষ দেবে—বরের নৌকোর আগে পিছে আলাদা ডিঙিতে পাহারা দিয়ে তারা বিয়েবাড়ি পৌঁছে দেবে। গাঙের এপারে-ওপারে কেউ চোখ তুলে চেয়ে দেখবে না। বিয়ের পর বর-বউ এবং গোলবাড়ি ছেড়ে অন্য যাঁরা চলে যেতে চান সকলকে নিয়ে স্টেশনে একেবারে রেলগাড়ির

খোপে তুলে দিয়ে তবে তাদের ছুটি। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না। কিছু টাকা খরচের ব্যাপার, এই যা।

সাহেব-কর্তাকে বুঝিয়ে এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে মাখন মিত্তির বিয়ের দু-দিন আগে রওনা হয়ে গেল। ফিরবে বরের নৌকোয়, বরপক্ষকে সঙ্গে করে নিয়ে। বিয়ে-বাড়ির সকলে পথ তাকাচ্ছে। নৌকোও অনেকগুলো লাগল এসে ঘাটে। কিছু রাত হয়েছে। সেটা হবেই—পথঘাট দেখে বুঝে সামাল হয়ে আসতে হল। মশাল নিয়ে কন্যাপক্ষ বর এগুতে ছুটেছে। ওরে বাবা, এ কী কাণ্ড! সিংদরজা বন্ধ করে দেওয়া হল তাড়াতাড়ি। মানুষগুলোকে মেরে-ধরে, মশাল কেড়ে নিয়ে দরজার উপর টিন-টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাচ্ছে। সাহেব-কর্তা দোতলার গোলঘর থেকে দুড়ুম-দাড়াম বন্দুক ছুঁড়ছেন। কিন্তু ওদিকে কোন কায়দায় আর-একটা দল ছাতের উপর উঠে পড়েছে। ভিতর থেকে তারা সিংদরজা খুলে দিল।

তারপরের বৃত্তান্ত সবাই জানে। তখনকার খবরের কাগজে উঠেছিল, আপনারাও পড়েছেন সে-সব কথা।

মাখন মিত্তিরকে, ধরে নেওয়া হল, টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় পরে, চারিদিক ঠাণ্ডা, লোকে প্রায় ভুলেই গেছে সে-সব দিনের কথা। হঠাৎ একদিন গাঁয়ের মধ্যে মাখনের আবির্ভাব। এতদিন কোথায় ছিল, কী করছিল—একমাত্র কেউ যদি জানে, সে হলেন দয়ালহরি হোড়। তিনি ঘাড় নাড়েন, তাঁকেও নাকি কিছু বলে নি। হতে পারে ; ওই রকম ঘুঘু ব্যক্তি ভিতরের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে বলে না। আত্মীয় হিসাবে মাখন ওয়ারিশান—সে এসে বাড়ির জঙ্গল সাফ-সাফাই করে ফেলল। যেমন সেই গোলবাড়ির খোদ মালিকরা এসে পৌঁছবার মুখে করেছিল একবার। দাঙ্গার সময় দরজা-জানলা সমস্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল, সদর থেকে ছুতোর এনে একালের ফ্যাশান-মত গোটা কয়েক ঘরের বড় বড় দরজা-জানলা বানিয়ে নিল,

দামি খাট-বিছানা ও আসবাবপত্র কিনে আনল নৌকো ভরে। বলল, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে এসে কায়েমি বসবাস করবে বিরাটগড়ে। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন। আগের বারে শোনা যেত প্রথম বয়সে বউ গত হবার পর বিয়ে-থাওয়া করে নি, করবেও না আর জীবনে। এখন অবস্থা অতিরিক্ত সচ্ছল হওয়ায় প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে সম্ভবত।

সে যাই হোক, বউ আনা অবধি সবুর সইল না—ক'দিন মাত্র থেকেই চোঁচা দৌড়। এত পয়সা খরচ করেছিল—তারপর কত-দিন কেটেছে, একখানা পোস্টকার্ড লিখেও খবরবাদ নেয় নি। নাকি ভূতের বাড়ি—প্রভুরা কিলবিল করেন ঘরে উঠানে ও আমতলায়। রাত্রি হলে মচ্ছব লেগে যায়। বাড়ি মেরামতের সময় মাখন মিস্ত্রির বিস্তর শান্তিভঙ্গ করেছে তাঁদের। তা ছাড়া যদি সাহেব-কর্তা ও তাঁর পরিজনবর্গ হন, তবে তো পুরানো রাগ থাকবারও কথা। মোটের উপর, চোখের দেখা মাত্র নয়—রীতিমত মোলাকাত হয়েছে নাকি মিস্ত্রিরের সঙ্গে: ভালয় ভালয় সরে পড়, নয়তো বিপদে পড়বে। গুচ্ছের খানেক টাকা গিয়েছে, কিন্তু এমন শাসানির পরেও কার বুকের পাটা আছে ওই ঘরবাড়িতে পড়ে থাকতে পারে?

আমাদের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু গোড়ায় ছিলেন না, পরে এসে পড়লেন। তিনি হেসে খুন: ভূত, না ঘোড়ার ডিম ভায়া। আমি আজকের লোক নই। চোখের উপর সমস্ত দেখলাম। বিষম পাপীলোক মাখন, মনে মনে তার প্রতিক্রিয়া আছে। একটা রাত্রি বাস করে সকালবেলা ডাক্তারের জরুরি ডাক পড়ল। সমস্ত রাত মাখন আবোল-তাবোল বকেছে—মাথা খারাপ হবার অবস্থা। এক নজর দেখেই রোগটা আমি আন্দাজ করে ফেললাম। জেরায় বাকিটুকু বেরিয়ে গেল। সত্যিই লোকটা বড়লোক হয়ে পড়েছে। নৌকো বোঝাই করে ওই যে দামি দামি

আসবাব নিয়ে এল শহর থেকে, নৌকোর পাটার তলায় কাঠের বাক্স ভরতি আরও বস্তু ছিল—খাঁটি বিলাতি মাল। তারই ক্রিয়া। সন্ধ্যার পর থেকে এমন বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ত, সে চোখে গরু-মানুষ, পেত্নি-ভূতের তফাত থাকে না। সকালবেলা আমি গেছি, তখনও তার জের রয়েছে।

বড় দারোগাবাবু স্ফূর্তি দিচ্ছেন: শুনলেন তো, ওইখানে গিয়ে উঠুন তবে। লেখাপড়া শিখেছেন, বয়স অল্প—কুসংস্কার কেন থাকবে গোমুখ্যুদের মত! কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব, সমস্ত রাত্রি টহল দিয়ে বেড়াবে। তার উপরে আপনার হরিশ্চন্দ্র—ভূতের বাপ ব্রহ্মদত্যিও এগোবে না ওই পেল্লায় পুরুষের সামনে। চাই কি আপনি নিজেও বন্দুকের লাইসেন্স করে নিন একটা। কিছু শক্ত নয়, কালেক্টরকে বলে আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভাল হবে, বাঁওড়ে খুব পাখি পড়ে—পাখি মারতে যাব দল বেঁধে।

এত কথার পরেও চুপচাপ থাকলে নেহাত কাপুরুষ ভাববেন সকলে। দেখা যাক দু-পাঁচ দিন, গোলমাল বুঝলে ছুতো-ছাতায় বেরিয়ে পড়া যাবে। দয়ালহরিও তখন উৎসাহ দেখাচ্ছেন: আমার বাড়ি একেবারে কাছে হুজুর। মাঠের এপার ওপার হররোজ দেখা-শুনো হবে। সামনের উপর হানাবাড়ি দেখে মেয়েদের গা ছমছম করে, বেলা না ডুবতে ঘরে ঢুকে দুয়োর দেয়। গোলবাড়িতে মানুষের ওঠাবসা হলে সোয়াস্তি পেয়ে যাই।

উঠলাম গিয়ে গোলবাড়ি—যা থাকে কপালে। চাবি খুঁজে পেতে দয়ালহরির একটা বেলাও দেরি হল না। ঘর চমৎকার। ডিসটেমপার-করা দেয়াল—মানুষ যাই হোক, মাখন মিত্তিরের রুচি আছে। জংলি গাঁয়ের পোড়োবাড়ির ভিতর একটুকু ইন্দ্রপুরী বানিয়ে গেছে। নতুন বাসা খুব পছন্দ আমার। দুয়োর আঁটলেই নিঃশঙ্ক। এক ওই ওঁরা থাকলেন, লোহার দুর্গ বানিয়েও যাঁদের

বোঝা যায় না। বেশ তো, মিলে মিশে থাকা যাক সকলে—একলা প্রাণী আমাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে এক প্রান্তে একটি ঘরে থাকতে দিন। দেখা হলে আরজি জানাব। অনুরোধ অন্যায্য নয়, অতএব মঞ্জুর হবে আশা করতে পারি।

কিন্তু দেখাই পেলাম না কারও। মিথ্যে বলব না—প্রথম দুটো-একটা রাত ভয়-ভয় করত, তারপরে ভুলেই গেলাম। যত আজগুবি রটনা। ডাক্তারের কথা ঠিক—মাতাল মানুষের দৃষ্টি-বিভ্রম। অপরাধী অনুশোচনার বশে কী সব দেখেছে! মাখন মিত্তির পালাল, বাড়ির বদনাম সেই থেকে অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ল। আমার পক্ষে ভাল, নয়তো কি এমন ঘরবাড়ি খালি পড়ে থাকত, কবে আমি এসে অধিষ্ঠান করব সেই অপেক্ষায়?

সামনের গোলঘরে সাহেব-কর্তার বৈঠকখানা ছিল বোধ হয়। আমার শোওয়া-বসা সমস্ত সেখানে। দারোগা পুরোপুরি প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। কনস্টেবল পাহারা দিতে আসে। একঘুমের পরও জানলা দিয়ে দেখেছি, লোকটা ফটকের চাতালের উপর বসে আছে।

মাস দুয়েক কেটে গেল, আছি বেশ আরামে। গোড়ার দিকে হরিশ ঘরের ভিতর মেঝেয় বিছানা করে শুত, এখন কড়াকড়ি নেই, দরদালানে গিয়েও শুতে পারে। শোয়ও তাই। বিছানায় বসেই বিড়ি ধরাতে পারে, ঘন ঘন বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসবার প্রয়োজন হয় না। জানি না, মাখন মিত্তির সত্যি কিছু দেখেছিল কি না! তা-ও যদি হয়, এতদিনে তাঁরা বাস উঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র সরে পড়েছেন। কোন সন্দেহ নেই।

বন্দুকের লাইসেন্স হল। বড় দারোগাই কালেক্টরির নিলাম থেকে একটা বন্দুক সস্তার মধ্যে সংগ্রহ করে দিলেন। বন্দুক দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে সেই দিন সন্ধ্যার আড্ডায় তাঁকে বললাম, আর কেন, কনস্টেবল সরিয়ে দিন এবার। বেচারিকে মিছামিছি রাত জাগিয়ে আমায় শাপমন্যির ভাগী করছেন।

বড় দারোগা বললেন, শাপমন্তি কেন দেবে, ও-লোকের চাকরিই এই। পাহারা দেওয়া। আপনার এখানে না হলে অন্য কোথাও দেবে।

পাহারা দেবে, তা জেগে থাকতে যাবে কেন? মাইনেও দেন ঘুমিয়ে পাহারার মত। আমি আপনাদের খাতিরের মানুষ, আমার বাসায় জেগে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। আর মনে মনে সারা রাত্তির গালি দেয় আমায়। কোন দরকার নেই—দেখা গেল তো এতদিন। ঝানু লোক মাখন মিত্তির—নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে গালগল্প চালিয়ে গেছে।

কনস্টেবল যথোচিত বকশিশ নিয়ে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। দয়ালহরিও নির্ভয়। এদিককার ছায়া মাড়াতেন না—গোলবাড়ির সামনে পড়তে হবে সেজন্য, শুনেছি, ওঁর বাড়ির পিছন দিককার শুঁড়িপথ দিয়ে চলাচল করে এসেছেন এ যাবৎ। এখন দিনে রাতে এই পথে আনাগোনা। বাড়ির সামনে এসে অন্তত পক্ষে একবার 'হুজুর' বলে ডাক দিয়ে আপ্যায়ন করে যান। নজরে পড়লে ঢুকে পড়েন ফটকের ভিতর।

ভাল লাগছে তো হুজুর? কোন রকম অসুবিধা হলে গোলামের কানে যেন পৌঁছয়। উই যে খোড়ো চাল দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ওঠা-বসার ঘর আমার। জোরে হাঁক দিলেই শুনতে পাব। ঘরের পিছনে চণ্ডীমণ্ডপ। ঠাকুর তোলবার সাধ্য নেই, চণ্ডীমণ্ডপে গরু থাকে এখন। নাটমণ্ডপটা একেবারে পড়ে গেছে। তারপরে পাঁচিল, ভিতর-বাড়ির আরম্ভ হল। পুরা দশ বিঘের উপর ভদ্রাসন। এলাহি ব্যাপার। একদিন কিন্তু হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে হবে। বড় বউ আজকেও বলছিল।

যাব বই কি। আপনাদের গ্রাম—আপনার পাড়ার মধ্যে, বলতে গেলে, আপনারই আশ্রয়ে আছি। এই যে নবাবি হালে রয়েছি—আপনি থেকে চাবি খুলে বন্দোবস্ত করে দিলেন, তবে তো! যেদিন সুবিধা, আপনি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

সে সুবিধা আজও হয়ে ওঠে নি। অবস্থা বুঝি। এককালে হয়তো সচ্ছলতা ছিল, মেজাজখানা আছে, নিয়ে গিয়ে খুব ধুম-ধাড়াক্কা করার ইচ্ছা, কিন্তু সঙ্গতিতে কুলিয়ে ওঠে না। আমিও উচ্চবাচ্য করি নে। কথা উঠলে বরঞ্চ চাপা দিতে চাইঃ হবে একদিন হোড় মশায়, তার জন্যে কী? আছি আপনার উঠানের পরে বললে হয়, এক ডাকের ওয়াস্তা। কাজের চাপটা কমুক, আমি নিজেই তখন বলব।

পুজোর সময় কলকাতায় কাটিয়ে এলাম কয়েকটা দিন। কী আশ্চর্য, এ আমার কেমন হল, এত পেয়ারের শহর—এখন যে একটা দিনেই হাঁপ ধরে আসে। সারবন্দি যত ইটের খাঁচা, পোকা-মাকড়ের মত মানুষ তার মধ্যে কিলবিল করে। খটখটে বাঁধা-রাস্তাগুলো জুতোর তলায় যেন মুগুর মারছে প্রতি পদে। বিশ্রী, বিশ্রী! অবাক হয়ে যাই, এই ক'মাসে মানুষটা কত আলাদা হয়ে গেলাম! তখন ভাবনা ছিল, কী করে জল-জঙ্গলের পাড়াগাঁয়ে থাকব! এখন অতখানি স্পষ্ট না হলেও মনে মনে বিতৃষ্ণা, লোকে কেমন করে শহরে কাটায় আঁট-সাঁটো মাপের জীবন নিয়ে। দুর্দান্ত স্বামী বশ করার অনেক শিকড়-বাকড় ঝাড়-ফুঁক চলিত আছে পাড়াগাঁয়ে। বিরাটগড়ের থানায় এক বউকে ধরে এনেছিল, ভাতের সঙ্গে অজান্তে শিকড়বাটা খেয়ে ভেদবমি হয়ে পুরুষটার যায়-যায় অবস্থা। সে যাই হোক, ক্বচিৎ কখনও প্রাণহানি ঘটলেও শিকড়ের ফল নাকি অব্যর্থ। বাঘের মত স্বামী কেঁচো হয়ে বউয়ের আঁচলের নীচে গড়ায়। আমি ভাবছি, বিরাটগড় আমারও উপর তেমনি কোন ওষুধ প্রয়োগ করল নাকি?

এক আমার টুনু। ইস্কুলে দেওয়া হয়েছে তাকে, এবং ঘোর বেগে সে অ-আ ক-খ শিখছে। নিশ্বাস ফেলি। আহা, ঘুড়ি নিয়ে মাঠের এপার-ওপার ছুটোছুটি করে না, গাঙে ঝাঁপায় না,

গাছের মগডালে উঠে ডাল বাঁকিয়ে জামরুল পাড়ে না, বিলের আ'ল বেয়ে ছোট্ট ছাতা মাথায় গুটগুট করে নেমন্তন্ন খেতে যায় না ভিন্ন গ্রামে। কী-ই বা পাচ্ছে জীবনে। শুধু জুতো-জামা আর গোটা কতক খেলনা, ইস্কুলে যাওয়া, পরীক্ষা দেওয়া, বড় জোর বন্ধ ঘরে কোন একদিন সিনেমা দেখা মা-বাবার সঙ্গে। অথবা সেই একদিন চিড়িয়াখানায় দেখিয়ে আনলাম খাঁচায়-আটক কতকগুলো জন্তু-জানোয়ার—আর একটু বড় খাঁচায় ওরা সব যেমন রয়েছে।

চল্ টুনু আমার সঙ্গে। কলকাতা বিচ্ছিরি।

বউদি হেসে বলেন, তাই নিয়ে যাও ভাই ঠাকুরপো। হাড়ে বাতাস লাগুক আমার। কিন্তু থাকবে কার সঙ্গে? তুমি কাজে যাবে, টুনু তখন যার কাছে থাকবে সেই মানুষটাকে আন দিকি আগে। টুনুর টুকটুকে কাকিমা।

ওই কথারই জের চলল তারপরে। বউদি বললেন, এখন অকাল চলছে। অঘ্রাণে নয়তো মাঘ মাসের গোড়ার দিকে ছুটির বন্দোবস্ত কোর।

দেখা যাবে। মনে করিয়ে দিও সেই সময়।

ওসব জানি নে, আসবেই তুমি। নতুন একটা মেয়ে দেখলাম ফড়েপুকুরে। আমি বলি কী, এই যাত্রায় তুমি মেয়েটা দেখে যাও। মেয়েওয়ালাদের খবর পাঠিয়ে দিই, কেমন? বড় ভাল মেয়ে।

ভালর উপরে আরও তো ভাল আছে বউদি। তার উপরে আরও। সেই মাঘ অবধি কত ভাল তলিয়ে যাবে, কত কত নতুন ভাল উঠবে। কোথাও আমি যেতে পারব না। ছুটিতে এসেছি—নড়ে বসব না, স্রেফ শুয়ে বসে কাটিয়ে যাব। যা করতে হয় তুমি একাই সব পারবে।

দাদারও সেই কথা: তোমার ভাল কদ্দূর উঠে সোয়াস্তি পাবে, নিজে জান না। তোমার বিধাতাপুরুষেরও ধারণা নেই। ছুটো দিনের জন্য এসেছে, ওকে কেন টানাহেঁচড়া কর?

ভোটে হেরে বউদি চুপ করে গেলেন। আমি কিন্তু শুয়ে বসে নেই একটা দিনও। বিরাটগড় থেকে একটা খাতা কবিতায় ভরাট করে এনেছি—এই ক'মাসের ফসল। খাতা-সহ কলকাতার নামী লেখকদের আড্ডায় ঘোরাফেরা করি। কায়দা বুঝে শুনিয়েও দিই দু-চারটে। এবং অবাক কাণ্ড, আহা-ওহো করেছেনও কোন কোন ব্যক্তি। এই নতুন স্ফূর্তিতে পাগল হয়ে আছি। পুরানো বন্ধুরা প্রায় সব বাতিল। গানেও মন নেই। ডুগি-তবলায় কয়েকটা বোল তুলেছিলাম চাকরি পাবার আগে। এসে দেখেছি, তবলার ছাউনি ইঁদুরে কেটেছে। আপদ গেছে। ডুগির উপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে সেটারও ছাউনি ফাঁসিয়ে দিলাম।

বউদি বললেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি কয়েকটা দিন বাড়িয়ে নাও। চাঁপাতলা কি ফড়েপুকুর যেখানে হোক, পাকা-দেখাটা চুকিয়ে দিই। খানিকটা নিশ্চিন্ত। তারপরে চাকরিতে যেও।

আরে সর্বনাশ, চাকরি চলে যাবে। ঝাড়ুদারের চাকরির জন্যেও মাট্রিক পাস দরখাস্ত নিয়ে ছোটে। কী দিনকাল পড়েছে, জান না বউদি।

চাকরির কথা প্রসঙ্গে দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, উপরওয়ালার সঙ্গে জমল কী রকম শুনি? বদলি হবার বন্দোবস্ত কিছু হচ্ছে?

মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিই, দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছি তো এক নাগাড়—

শুধো দরখাস্তের কাজ নয়। শোন, নতুন গুড়ের কিছু ভাল সন্দেশ নিয়ে যাও এবার কলকাতা থেকে। দরখাস্তের সঙ্গে দিও।

কিন্তু কোথায় দিতে হবে, তাই তো জানি নে। শেষটা হিতে-বিপরীত না ঘটে বসে!

দাদা খিঁচিয়ে ওঠেন: কী করছিলে তবে এতকাল ধরে? শুধু কাজ করে গেলেই হয় না। কাজ দেখিয়ে উন্নতি হয়, শুনেছ

কোনদিন? তদ্বির চাই। ওই ধাপধাড়া জায়গায় দেখতে পাচ্ছি চিরকাল তোমায় পচে মরতে হবে। বয়স হচ্ছে, ভেবেছিলাম জ্ঞানবুদ্ধিও হয়েছে। নাঃ, একেবারে কিছু নয়।

ঘাড় নিচু করে নির্বাক থাকি, আর কী করব! শহরের চাকরিতে বসে দাদার জ্ঞানবুদ্ধি খুলে গেছে। আমিও এসব একেবারে বুঝি না, তা নয়। কিন্তু যত-কিছু বললাম, তাহা মিথ্যা। দরখাস্ত গোড়ার দিকে দু-একটা ছেড়েছি, এখন অনেকদিন আর উচ্চবাচ্য করি নে। বিরাটগড়ে লোকের ভিড় কম, কবিতার পক্ষে এটি প্রশস্ত। অহরহ লোকগুলো তটস্থ হয়ে 'হুজুর হুজুর' করে—আমা হেন ব্যক্তিকে এত বড় খাতির দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র বিরাটগড় ছাড়া অন্য কোনখানে কেউ করবে না। দাদা যাই বলুন, এই ধাপধাড়া স্থানেই থাকতে চাই আমি আপাতত কিছুকাল।

বিরাটগড় ফিরে দেখি, হরিশ ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। সরকারি চাপরাসি হওয়ার দরুন বরের বাজারে হু-হু করে তার দর চড়ে গেছে। সেই লোভ সামলাতে না পেরে বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলেছে ছুটির মধ্যে। যথাসময়ে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে বিয়ে করে এল। তারপরেই নতুন উপসর্গ—রাত্রে আমার সঙ্গে গোলবাড়ি থাকতে পারে না, রাঁধাবাড়া করে খাইয়ে দিয়ে চলে যায়। আমার হয়ে গেলে নিজে এক কাঁসর ভাত নিয়ে বসে না আগেকার মত। হন্তদন্ত হয়ে বেরোয়, এঁটো-বাসন পড়ে থাকে, সকালবেলা এসে মাজা-ধোওয়া করবে। বুঝতে পারি, বাড়িতে তার জন্য ভাত বেড়ে থালা সাজিয়ে বসে আছে আর-একজন। আমার আপত্তি নেই—বরঞ্চ ভালই। হরিশ চলে যাবার পর খাতা খুলে সশব্দে নিজের কবিতা পাঠ করি। যতই হোক, হাকিম মানুষ—চাপরাসির সামনে সুর করে কবিতা পড়তে লজ্জা-লজ্জা করে।

ডাক্তারবাবু বড় ভাল লোক। যত পরিচয় হচ্ছে, মজে যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে। তিনি ঠাট্টা করেন: চাপরাসি বিয়ে করে ফেলল, হাকিমের সাহস হয় না। না ভায়া, এর পরে একলা থাকা আর মানাচ্ছে না।

দয়ালহরি সেখানে। তাঁকে বললেন, কোমর বেঁধে ঘটকালিতে লাগ দিকি হোড় মশায়। তোমায় লোকে এত ধুরন্ধর বলে, দেখি সেটা কী রকম!

আমি বলি, খুব খাঁটি কথা বলেছেন ডাক্তারবাবু, সাহস হয় না সত্যি। হবে কী করে? কপাল খারাপ, তাই চাপরাসি না হয়ে হাকিম হয়েছি। হাকিমের গোনাগুনতি মাইনে—সরকার যে ক'টি তঙ্কা দেন, বাড়তি এক পয়সাও নয়। চাপরাসি দুয়োর ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—যত লোক দলিল রেজেস্ট্রি করবে, নিদেন পক্ষে একটা দুয়ানি গুঁজে দেবে তার হাতে।

হাসতে হাসতে দয়ালহরির দিকে চেয়ে বলি, হরিশকে সমঝে দেবেন তো হোড় মশায়, হাকিমের চোখের উপরে অমন যেন হাত না পাতে। যা করতে হয়, মক্কেলদের আড়ালে-আবডালে নিয়ে করবে।

হাকিমত্বের ব্যবধান আমি ঘুচিয়ে দিলেও দয়ালহরি মানেন কী করে? ডাক্তারবাবুর অথবা আমার একটি কথাও যেন কানে যায় নি, এমনিধারা ভাব দেখিয়ে হরিশকে ডাকতে ডাকতে তিনি দরদালানে চললেন। ভেবেছিলাম, সমঝে দিতে গেলেন এখনই। কিন্তু সে ব্যাপার নয়। স্ত্রীর নাম করে বলছেন, বড় বউ কী জন্যে ডাকছে তোকে বাবা। আমার সঙ্গে চলে আয়। দেরি করিস নে।

তার মানে রান্না-করা তরকারি, কখনও বা পিঠে-পায়স। আগে লাউটা কলাটা হাতে করে আসতেন, বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় ইদানীং রাঁধা ব্যঞ্জন আসছে। প্রায়ই আসে এমনি। বুড়ো মানুষটি মাঠের আ'লপথ ধরে নিজের হাতে বয়ে আনতেন।

একদিন কড়াভাবে মানা করে দিলাম: ছি-ছি, সম্ভ্রান্ত প্রবীণ মানুষ নিজে এমনি করে আনবেন তো আমি কক্ষণো স্পর্শ করব না। এই আমার শেষ কথা। সেই থেকে হরিশকে ডেকে নিয়ে যান। এবং ভাষাটা ওই। বিদেশ-বিভুঁয়ে একলা পড়ে থাকি—আর শ্রীমান হরিশের রান্নার যে রকম তরিবত। বিয়ের পরে আরও যেন বাহার খুলেছে, আর দশটা বস্তুর সঙ্গে রন্ধন-বিদ্যাও যেন বউকে সমর্পণ করে বসে আছে। সকালবেলা মাছের ঝোলে নুন দেয় নি তো তাড়া খেয়ে সন্ধ্যাবেলা ডবল করে নুন দিল। দৌড়ঝাঁপের রাঁধাবাড়া—সকালে অফিস, রাত্রিবেলা নতুন বিয়ের বউ। এই সব বিবেচনা করে আমিও গলাধঃকরণ করে যাই—নুন বেশি হলে জল ঢেলে হালকা করে নিই, কম হলে নুন মাখি। হেন অবস্থায় মুখে যাই বলি, মনে মনে প্রত্যাশা, হোড় মশায়ের বাড়ির বড় বউ কখন ডেকে পাঠান হরিশকে। দিন পাঁচ-সাত ডাক না পৌঁছলে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি: রাগ করলেন নাকি বড় বউ এবং ও-বাড়ির অন্যান্য যাঁরা আছেন?

রাগের কারণও কিছু ঘটতে পারে। ঐ যে শুনলেন—গোলবাড়ি আর দয়ালহরির বাড়ির মাঝখানে মাঠ একটা। মাঠ খুব বড় বটে, কিন্তু আউশ ধান কাটা হয়ে গেছে, দয়ালহরির বেড়ার জিওল-গাছের পাতাও ঝরে গেছে সমস্ত। গোলবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের বাইরের উঠোনের কাজকর্ম চলাফেরা দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াই। হাকিম মানুষকে গাঁয়ের মধ্যে সতর্ক হয়ে চলতে হয়। কারাগারের মতন কতকটা। হোড়-বাড়ির দিকে যখন-তখন তাক করে আছি, লোকে দেখতে পেলে কথা উঠবে। ওঁরাও বা কী মনে করবেন? বুঝি সমস্ত। তবু কেমন ইচ্ছে হয় অমনি এসে দাঁড়াবার। সামলাতে পারি নে। আমার বউদির ঘর-গৃহস্থালি থেকে আলাদা হয়ে অনেক দিন একা একা আছি। তাই বুঝি ঝোঁক চাপে গৃহস্থালির এইটুকু চোখে দেখবার।

একদিন হরিশকে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করে বললাম, একটা মেয়ে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। আগে কখনও দেখি নি।

অফিসে হরিশ চাপরাসি, কিন্তু অনেক দিন পাশাপাশি রাত কাটানোর দরুন বাসায় সময়বিশেষে সে সখাস্থানীয়।

হোড় মশায়ের বাইরে-বাড়ি ওটা বেগুনক্ষেত বুঝি? দেখিস নি হরিশ, এক ঢ্যাঙা হাড়গিলে মেয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে বেগুন তুলে বেড়ায়?

হরিশ বলে, সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে-থাওয়া হবে—অমন করে কুচ্ছো করতে নেই হুজুর। চেহারায় না হোক, মনটা বড্ড ভাল। হেসে ছাড়া কথা বলে না। হোড় মশায়ের মেয়ে। আপনাদের কলকাতায় থাকত। মা-শীতলার দয়া হল, অসুখ থেকে উঠে চলে এসেছে। বড় ভোগান্তি হয়েছে। বড়-বউঠাকরুন শীতের মরশুমে হাঁপান তো পড়ে পড়ে। মেয়েটা এসেছে, ভাত-জল পাচ্ছেন তাই সকলে। নয়তো হোড় মশায়কেই হয়তো হাঁড়ি ঠেলতে হত।

গাঁয়ের মানুষ হরিশ, সব বাড়িতে আনাগোনা। বিশেষ করে দয়ালহরির বাড়ি হামেশাই এটা-ওটা আনতে যায় বলে ওখানকার সমস্ত খবর নখদর্পণে। বলে, ছোট্টবেলা থেকে শহরে মানুষ। বড্ড ফিটফাট থাকে হুজুর, আমাদের পাড়াগাঁয়ের মতন নয়। মামার কলকাতায় বাসা, সেখানে দিদিমার কাছে ছিল। দিদিমা মারা গেল, মামাও মরল। মামী জ্বালাযন্ত্রণা দেয়। ছিল তবু। বসন্ত হল তারপরে, মামী সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে বিদেয় করল। হোড় মশায়কে একটা চিঠি লিখেও খবর দেয় নি। মেয়ে হাসপাতাল থেকে সোজা টিকিট করে রেলে চেপেছে। আর ও-মুখো হবে না।

হাড়গিলে বলছি লম্বা ধাঁচের মেয়ে বলে। অত বড় মাঠ, তারপরে দয়ালহরির বাইরের উঠানটাও ছোটখাট নয়। আমিই বা দিনমানে কতটুকু সময় থাকি গোলবাড়িতে! তার মধ্যে কাজি-কর্মে মেয়েটা একবার হয়তো বাড়ির বাইরে এল। হাড়গিলে

কিংবা মাছরাঙা এত দূর থেকে এই সামান্য দেখায় তার বিচার হয় না। ওটা কথার কথা, বুঝতেই পারছেন।

হরিশ ফিকফিক করে হাসছে। বলে, চালচলন হুজুরের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। পুকুরে নামবে না কিছুতে, ডুবে যাবার ভয়। তোলা-জলে চান করে। হুজুরের জল তোলবার অসুবিধা নেই— আমি আছি, তা ছাড়া যে মানুষকে বলবেন, সোনা হেন মুখ করে, সে-ই এসে তুলে দিয়ে যাবে। ওর জল কে তুলে দেয়? তা দেখুন গে, কলস ভরে ভরে নিজেই জল তুলে জালা ভরতি করে রাখে।

এই এক পরিচয়েই মেয়েটা যেন আপন হয়ে গেল। গাঁয়ের মধ্যে আমরা দুটি স্বতন্ত্র নরনারী—সাধারণ দশজনের সঙ্গে বেমিল। মেয়েটা আজন্ম শহুরে। আমি গাঁয়ে থাকলেও এক দ্বীপের মধ্যে ছিলাম বলতে পারেন। লবণ-সাগর চারিদিকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, মাঝখানে আমাদের চকমিলানো বাড়ির বনেদি জীবনযাত্রা। (বর্ণনাটা কবির মতন হল না?) নদী-খালে না-ই হোক, খিড়কি-পুকুরেও কোনদিন গা ডুবিয়ে স্নান করি নি। জলের ভিতরে সাপ-কচ্ছপ-কাঁকড়া কখন কিসে কামড়ায়, কে বলতে পারে? দয়াল-হরির মেয়েও সম্ভবত তাই। অদৃষ্টের ফেরে দুজনে এই জঙ্গুলে জায়গায় এসে পড়েছি, কিন্তু শহরের অভ্যাস নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। আউশক্ষেতের ওপারে অস্পষ্ট দীর্ঘাকার একটুকু ছায়া দেখে সুখ হয় না—কাছাকাছি একদিন ভাল করে দেখতে পেতাম!

রবিবারে অফিস নেই। হরিশ রান্নাঘরে। আমি উঁকি দিই: অত কী রাঁধিস রে? হপ্তার মধ্যে কুল্যে এই একদিন ছুটি, তা দেখছি বেশি তোর কাজ পড়ে যায়।

হরিশের সত্যি একটা টান পড়ে গেছে আমার উপর। বলে, অন্য দিন তো খাওয়াই হয় না। দশটা না বাজতে আপিসে ছোটাছুটি—কোন গতিকে দুটো চাল ফুটিয়ে নিই। রাত্রেও ব্যস্ত,

ফাঁকা বাড়িতে একলা বউ। আজকে জেলেপাড়ায় গিয়ে খাসা কয়েকটা ট্যাংরা মাছ পেলাম—

রান্না পরে হবে। বাইরে আয়। গল্প করা যাক।

হরিশ বলে, কড়াইয়ে তেল চাপিয়েছি যে!

কড়া হয়েই বলি, তর্ক করিস নে, নামিয়ে রেখে আয়।

শশব্যস্তে হরিশ বলল, আসছি আজ্ঞে।

কিন্তু ওই মুখেই। ঘনিষ্ঠ হওয়ার দরুন হুকুমের জোর কমে গেছে। কড়াই নামায় না, মাছ ভাজা শেষ করে জল ঢেলে ঝোল চাপিয়ে বাইরে আসে।

আমার গল্পের গরজ ফুরিয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা মেয়ে এক্ষুনি জল নিয়ে গেল গোলবাড়ির পুকুর থেকে। পুকুর নয়, দীঘি বললে চলে। দামে আঁটা, ঘাটের কাছে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার। তবে জলটা খুব ভাল। অনেক বউ-মেয়ে কলসি কাঁখে জল নিতে আসে। সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় কখনও-সখনও নজরে পড়ে। পরনের শাড়ি হাঁটুতে উঠে এসেছে, যাবতীয় কাপড় জড় হয়েছে মাথার ঘোমটায়। কিন্তু এই একটা মেয়ে আজ আলাদা দেখলাম। খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো, ধবধবে কাপড়-পরা, ভরা কলসি নিয়ে মাঠের আ'ল ধরে ধীরে ধীরে চলে গেল। চলল দয়ালহরির বাড়ি। আমি দেখতে পেলাম, তখন অনেকটা দূর এগিয়ে পড়েছে। পিছন থেকে দেখছি। হরিশ থাকলে নিজ থেকে হয়তো বলত, হাড়গিলে বলেন হুজুর, ঐ দেখুন, মেয়েটা কি মন্দ? যদি অবশ্য দয়ালহরির সেই শহুরে মেয়ে হয়।

হরিশ যখন বেরুল, ততক্ষণে মাঠ পার হয়ে সে বাড়ি ঢুকে পড়েছে। ও-কথা কিছু হল না। আমি বললাম, দেখ হরিশ, গাঁসুদ্ধ জুটেপুটে আমাদের পুকুরের সব জল তুলে নিয়ে যাবার মতলব করেছে।

হরিশ বলে, আর দিনকতক যাক, দেখতে পাবেন পুকুরপাড়ে মেলা বসে গেছে। গাঁয়ের যত পুকুর-ডোবা শুকিয়ে তলার মাটি

ফেটে চৌচির হবে। তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে বুধহাটা-সুজন-পুরের মানুষ কলসি কলসি জল বাঁকে বয়ে নিয়ে যাবে।

হোড় মশায়ের বাড়ি থেকেও জল নিয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে কলসি বেরুতে কোনদিন দেখি নি।

হরিশ আশ্চর্য হল: বোশেখ না পড়তেই ওদের পুকুর শুকোল? আরও তো আস্ত কাল পড়ে আছে। এরকম হয় না কখনও।

হোড়ের পুকুরের জল এবারে তাড়াতাড়ি শুকানোর কারণ আমারই ইচ্ছাশক্তি কিনা জানি নে। সকালে এক কলসি নিয়ে গেছে, এবেলাও এল। ছুটির দিন বলে ছোট-দারোগা দুপুরে একহাত বসবার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মাথা ধরেছে বলে যাই নি। বেলা পড়ে গেছে, একটা চেয়ার টেনে এনে বসেছি আমতলায়। দেখে ফেললাম মুখোমুখি একবারে। আরও মেয়ে-বউরা জল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এক নজরে মালুম হল, এ মেয়ে আমাদের কলকাতার বটে! কলসি কাঁখের উপর ধরবার কায়দাটুকু শিখেনিতে পারে নি—অর্ধেক জল ছলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঠের আ'লপথে যাবার সময় পা হড়কে কলসিসুদ্ধ নীচে গড়িয়ে না পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পেল, সাব-রেজিস্ট্রার হাকিম গোলবাড়ির আমতলায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্য মেয়ে-বউ যেমন করে—কেউ হাত তুলে ঘোমটা বাড়িয়ে দেয়, কেউ-বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোন লজ্জাবতী মাঠ-পগার পেরিয়ে সজারুর মতন চোঁচাঁ ছুটে পালায় (সজারু বলছি যেহেতু পায়ের তোড়ায় ঝুনঝুন আওয়াজ ওঠে দৌড়ানোর সময়)। আর এ মেয়ে আমার দিকে একবার নজর তুলে দেখে, যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

এর পরে পিটুনি দিই না কী করি বলুন তো হরিশটাকে? এই মেয়ের বলেছিল চেহারা সুবিধের নয়। এবং রঙ চাপা। অর্থাৎ সাদা কথায় যার অর্থ হল কালো। আপনারা বলবেন,

ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছিল ওর মুখে—সময়টাকে কন্যা-সুন্দর বেলা বলে—কালো মেয়ে সময়ের গুণে ফরসা দেখেছি। বেশ তো, হোড়-বাড়ির পুকুর যখন শুকিয়ে গেছে এবং গোলবাড়ির পুকুরে অগাধ জল, জল নিয়ে কতবার আসবে যাবে, কত দিন দেখতে পাব। রোজ কিছু আর ডুবন্ত বেলা থাকবে না।

বেশি দেরি হল না, ঘণ্টা দশ-বারো পরেই। বিষম গুমট, হাওয়া একেবারে নেই। সবগুলো জানলা খোলা, তবু ঘুম হয় না রাত্রে। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। খুব ভোরবেলা। চাঁদ আছে আকাশে। জ্যোৎস্না আর ভোরের আলোয় মিলে মিশে গেছে। বিছানার উপর আধঘুমে পড়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পাই, আমতলায় সেই মেয়ে। কাল যেখানটায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখেছিলাম, ঠিক সেইখান থেকে দালানের দিকে মুখ করে আমায় দেখছে। ঘুম-জড়ানো আমার চোখে আজকে আরও চমৎকার লাগল। স্বপ্নের মেয়ে বলে মনে হয়। এক নজরে দেখছিল এতক্ষণ—যেইমাত্র পাশ ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে উধাও। পাখি যেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, দরজা খুলে চলে এলাম বাইরে। কোথায়! এত ভোরে কেন এসেছিল, কে জানে?

হরিশ এলে ঘটনা বললাম। ধরা-ছোঁওয়া না পায়, তেমনি-ভাবে সামাল হয়ে বলছি, ভোররাত্রে আমতলায় কাকে যেন দেখলাম। কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। চোর-টোর কিনা, কে জানে?

হরিশ হাসে: সবে এই শুরু। জষ্ঠিমাসটা পড়তে দিন, মানুষ আমতলায় রাতদিন চরে বেড়াবে। এই দেখে আসছি হুজুর, আম কুড়োবার সময় ভূতের ভয় থাকে না। বাগান এদ্দিন বেওয়ারিশ পড়ে ছিল—যেমন খুশি গাছে উঠে পাড়ত, তলায় কুড়াত। কানাইবাঁশি গাছের আম এগুতে পেকে যায়, সে খবর অবধি জেনে বসে আছে। পাকে বোশেখের গোড়ায়, এই চোত মাসে তার

টনক নড়েছে। আচ্ছা, আমিও আছি। ঐ গাছের যত আম কাঁচা-ডাঁসা সমস্ত আজ মুড়িয়ে পাড়ব। তখন কী লোভে আসে দেখি!

ব্যস্ত হয়ে বলি, উঁহু, অমন কাজও নয় হরিশ। একটি আম পাড়বি নে। যেমন আছে তেমনি থাকুক। চিরকাল দশজনে খেয়ে আসছে—দরকার নেই শাপমন্যি কুড়োবার। পেকে দুটো চারটে করে তলায় পড়বে, দেশের মানুষ কুড়িয়ে খাবে। সেই ভাল।

তাই ঠিক, আমের লোভেই এসেছিল। চলল এখন এই ব্যাপার। জল নিয়ে যায় ওই অতটা দূরের ঘাট থেকে। আম পড়ে একেবারে উঠানের উপর। অতএব উঠানেই আসতে হবে আম কুড়াতে। এখন এই কানাইবাঁশি—একে একে তারপর সব গাছের আম পেকে যাবে। বিকালবেলা ঝড় উঠবে কালবৈশাখীর, ফলন্ত ডাল আছাড়ি-পিছাড়ি খাবে। টুপটাপ শিলাবৃষ্টির মত পড়বে আম। আর জলে ভিজে ওরা সব তলায় তলায় ছুটোছুটি করবে। চলল এই এখন।

বউদির চিঠি পেয়েছি দিন চারেক আগে ঃ ছুটি নিয়ে এস। সকলে মিলে তা হলে ক'দিন দেশে কাটিয়ে আসা যায়। খুব নাকি আম হয়েছে এবারে। আমাদের হাঁড়ির-বাড়ি গোপালে-ধোবা বোম্বাইয়ের ডাল ভেঙে পড়ার গতিক।

যাই কি না যাই—চিঠি পাওয়ার পর থেকে দোমনা ছিলাম। আজকে জবাব চলে গেল, যাবার তো ইচ্ছে হয়েছিল বউদি, কিন্তু ছুটি দিল না। নতুন এক উপরওয়ালা এসেছে, বড় বেয়াড়া। জায়গা ছেড়ে যাবার উপায় নেই।

হরিশকে আম পাড়তে মানা করে দিয়েছি। আম পেকে টুকটুক করছে—করুক না। পাখিতে ঠুকরে ঠুকরে খায়—ক'টা আর খাবে? বছরের এই একটা-দুটো মাস বই নয়, সকলকে খেতে দিতে হয়। কোনদিন তুই গাছে চড়তে যাবি নে হরিশ।

সারাদিন সারারাত্রি টুপটাপ করে তলায় পড়ছে তো পড়ুক। পড়ে থাকুক অমনি, যার খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোর আমার জন্যেও দু-চারটে ওর ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনবি। কিন্তু বেশি নয়, খবরদার। ঘরে এনে গাদা করবি নে। দশজনে ভাগাভাগি করে খেয়েই সুখ।

জল নেবার সময় দয়ালহরির মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখি। কলসি নিয়ে ধীরে ধীরে আসে, কলসি ভরে নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে যায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখি। গোলবাড়ির হাতার মধ্যেও পেয়েছি দিন পাঁচ-সাত। আমতলায়—কিন্তু আম কুড়াচ্ছে না। এখানে ভিন্ন ভাব, লুকোচুরি খেলার ধরন। চোখাচোখি হতেই সরে চলে যায়। বুঝি সেটা। পাড়াগাঁ জায়গা—নিন্দে রটতে কতক্ষণ! দয়ালহরির বাড়ি থেকেও বোধ করি মেয়েকে সমঝে দিয়েছে: শহুরে রকমসকম বিরাটগড়ে চলবে না। তবু আসে লুকিয়ে-চুরিয়ে, এসে দেখে যায়। শুনেছে নিশ্চয়, শহর থেকে ছিটকে-পড়া আর-একজন আছে তারই মত। দুজনে ভিন্ন জাতের আমরা, অন্য সকলের থেকে আলাদা। সেই টানে চলে আসে।

একদিন অফিস থেকে ফিরছি। দয়ালহরিও চলেছেন, সঙ্গে চারজন ভদ্রলোক।

আপনাকে ক'দিন দেখতে পাই নি হোড় মাশায়। আপিসেও তো আসছেন না।

দয়ালহরি বললেন, এই এঁদের ওখানে গিয়েছিলাম। সাত-আট ক্রোশ দূর ষষ্ঠীপুকুর, কাছে-পিঠে নয়। লাবণ্যর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

দয়ালহরির মেয়ের নাম পাওয়া গেল লাবণ্য। নাম বেশ মানান করে রেখেছেন। না জেনেও আমি বোধহয় আন্দাজে বলতে পারতাম এই নাম। লাবণ্য, লাবণ্য। কিন্তু দয়ালহরির কী রকম

কাণ্ড, কোন্ সব মানুষ বাড়ি নিয়ে তুলছেন মেয়ে দেখানোর জন্য! এরা মাথার চুল খুলে দিয়ে মাপবে, হাঁটিয়ে দেখবে, ইঁচড়ের ডালনা কোন্ প্রক্রিয়ায় রান্না হয় প্রশ্ন করবে। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মাঠের ধারে এসে পড়েছি। জুতো খুলে ফুঃ-ফুঃ করে ধুলো ঝেড়ে হাতে করে নিচ্ছে এবারে আ'লের উপর উঠবে বলে। খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে সেজন্য। জুতো পরার অভ্যাস বেশি আছে বলে মনে হয় না। জুতো পায়ে এমনিই বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল, খুলে নিয়ে বাঁচল।

বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে হোড় মশায়?

দূরবর্তী কুটুম্বদের দিকে এক নজর তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে দয়ালহরি বলেন, কোথায় কী! সবে তো মেয়ে দেখা—মেয়ে পছন্দ হবে, দেনাপাওনার আশকারা হবে। লাখ কথায় কমে বিয়ে হয় না। গয়নায় মোটামুটি আমি গা সাজিয়ে দেব। সাবেকি জিনিস কিছু ঘরে আছে, নতুন করে গড়াতে হবে না। কিন্তু নগদ খাঁই হলে পেরে উঠব না। এই মেয়েই সব নয়। আরও কত রকম দায় আছে। হিসেব করে চলি বলেই মানসম্ভ্রম নিয়ে টিকে আছি ভিটের উপর।

গায়ে-পড়া হয়ে পরামর্শ ছাড়িঃ নগদ চাইল না বলেই অমনি কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। মেয়ে ফেলনা নয়, বিচার-বিবেচনা করবেন। পাত্র কী রকম শুনি?

এক-মুখ হেসে গদগদ হয়ে দয়ালহরি ঘাড় নাড়লেনঃ সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। পাত্র ভাল বলেই তো মরি এমন ছুটোছুটি করে। লেখাপড়া জানে, ম্যাট্রিক পাস। প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত হয়েছে। সরকারি চাকরি—বয়স বাড়লে মাইনে কোন না ষাট-সত্তরে দাঁড়াবে। ঘরের খেয়ে মাস অন্তে অতগুলো টাকা—কোনরকম ঝামেলা নেই, এক পা নড়ে বসতে হবে না। লেগে যায় তো জষ্ঠির শেষাশেষি দিন ঠিক করে ফেলব। শুভস্য শীঘ্রম্, কী বলেন?

গলা আরও নামিয়ে বলতে লাগলেন : এর বেশি কোথায় পাচ্ছি ? লাটসাহেব কে আমার জামাই হয়ে ছাদনাতলায় বসবে ? মেয়ে যদি অপ্সরী-কিন্নরী হত কিংবা বস্তা ভরে টাকা ঢালতে পারতাম, তবে না হয় কথা ছিল। কী বলেন ?

বারম্বার আমায় সালিশ মানেন, মনে যা-ই থাক, ঘাড় না নেড়ে উপায় কী! কুটুম্বর দল এসে পড়েছে, নিতান্ত কানা-চোখ এবং অর্থপিশাচ না হলে অমন মেয়ে ছেড়ে যাবে না সুনিশ্চিত। এক পাড়ার মধ্যে থাকি, এবাড়ি-ওবাড়ি, দিনরাত দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, বাড়ি থেকে রাঁধা-তরকারি পাঠিয়ে খাতির দেখানো হয়। এবং হরিশের মুখে শুনি, তার দু-একখানা লাবণ্যর নিজের হাতের। অথচ বিয়ে-থাওয়ার মতন এতবড় ব্যাপারে আগেভাগে একটি মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন না ?

পাড়াগাঁ জায়গায় কুটুম্বরা রাত্রিবেলা কখনো চলে যাচ্ছে না, জোর খাওয়া-দাওয়া আজ দয়ালহরির বাড়ি। ঘরে বসে আমিও ভাগ পাব। হরিশ হাসতে হাসতে সেই কথা তুলল। হেসে বলে, আজ কিছু রাঁধতে হবে না। দুটো চাল ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে। তা-ও লাগবে না হয়তো, হোড় মশায় লুচি-টুচি পাঠাবে।

আমি আগুন হয়ে উঠি : দিন-কে-দিন কী হ্যাংলামি বাড়ছে তোর! তার মানে সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে উঠতে চাস। বেশ তাই, আজকে তোর রাঁধতে হবে না। বাড়ি চলে যা, আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে খাব।

মেজাজ দেখে হরিশ অবাক! এমন অনেক দিন হয়েছে, দয়ালহরি হাট করে বড় ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন —আমিই বলেছি, দেরি করে উনুন ধরাবি হরিশ। ভাতটা গরম গরম চাই। অমন ইলিশের ঝোলের সঙ্গে গরম ভাত ছাড়া জমবে না। আমার ওই ভাব জেনেই তো হরিশ বলল, তার কী দোষ ?

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! ভাত-তরকারি ষোলআনা রান্না করে খাইয়ে দিয়ে হরিশ অনেকক্ষণ চলে গেছে। রাত দুপুর হল।

দয়ালহরি খোঁজ নিলেন না তো আমার! হরিশের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে, তিনি তা জানবেন কী করে? অনেকবার রাস্তা অবধি বেরিয়েএসে হোড়-বাড়ির দিকে তাকিয়েছি। কুটুম্ব আসার দরুন বাইরের ঘরে বেশিক্ষণ ধরে আলো জ্বলবার কথা—তা-ও তো কিছু মনে হচ্ছে না।

পরদিন রেজেস্ট্রি অফিসে যথাস্থানে দয়ালহরিকে দেখলাম। ঘাড় হেঁট করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। জুতোর শব্দে ঘাড় তুললেন একবার। অপ্রসন্ন বলেই মনে হল। অফিসের মধ্যে হাকিম আমি, ঘরোয়া কথাবার্তা চলে না। বিকালে বাসায় ফিরছি, তখন দেখি পিছু পিছু আসছেন। আমারও উদ্বেগ আকণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। প্রশ্ন করলাম, খবর কী হোড় মশায়? পাকা কথাবার্তা হয়ে গেল?

বারুদে আগুনের ফুলকি পড়ল যেন।

বলবেন না, বলবেন না। ছোটলোক, পাজির পা-ঝাড়া। তিন-তিনটে দিন আমার সকল কাজকর্ম বন্ধ। গুরুঠাকুরের মত তোয়াজ করে বাড়ি ডেকে আনলাম। এল তা-ও একটি দুটি নয়, পুরো এক গণ্ডা। নৌকোভাড়ায় সাড়ে পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। পান-বিড়ি মুহুর্মুহু এনে ধরছি মুখের কাছে। তা খেয়েদেয়ে মুখের উপর কিনা বলে, মেয়ে ভাল নয়—নগদ টাকায় কদ্দুর কী পুষিয়ে দেবেন, সেই কথাবার্তা আগে।

বলেন কী! কোন্ সাহেব-বিবির দেশের লোক—ওই মেয়ের নিন্দে করে?

দয়ালহরি বললেন, সে ধরি নে। নজর সকলের সমান হয় না। হাটে লাউ-বেগুন কিনতে গিয়েও লোকের কত রকম বাছাবাছি, কত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাই বলে কটকট করে মুখের উপর বলবে, এক হাজার এক টাকায় ও-মেয়ে ঘরে নিতে পারি। আধলা পয়সা কম হবে না।

আচ্ছা অভদ্র তো।

পাড়াগাঁয়ের গাছমুখ্যু—মেয়ে আমার কলকাতায় মানুষ, লেখাপড়া জানে, তার কদর ওরা কী বোঝে? হাজার টাকা। টাকা দিয়ে অমন ঘরে কাজ করতে যাব কেন? হাজারটা পয়সাও দেব না, এই আমার পণ। সে যাক গে, না পোষায় না করলি। কিন্তু দরাদরিটা আড়ালে হলেই হত। সেইটে আমার বেশি রাগের কারণ। কী বলব হুজুর, মায়ের তু-চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

অশ্রুমুখী অপমানিতা মেয়েটিকে যেন চোখের উপর দেখছি। মনে মনে তবু আনন্দ। ঝড় ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা কেটে গেছে যেমন করেই হোক।

দয়ালহরি বললেন, আমিও ছাড়ি নি হুজুর। রাগের মাথায় রাজভাষাই বেরিয়ে গেল। গেট আউট, এক্ষুনি বেরোও। রাত্তির-বেলা, উড়োকালে সাপখোপের ভয়—তা মগজে রক্ত চড়ে গেল কেমন। হাট থেকে এক কুড়ি গলদা-চিংড়ি কিনেছিলাম, সকালবেলা পচা মাছগুলো আদাড়ে ফেলে দিলাম। রাতে রাঁধাবাড়া হয় নি, বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এর পরে একরকম চুপচাপ চলেছি। ভাবছি। দয়ালহরির জানবার কথা নয়—আমি তো দেখে নিয়েছি মেয়েকে। মেয়ে খারাপ বলে কোন্ বিবেচনায়? ভুল হল তবে নাকি আমার? অন্য কাউকে দেখেছি? কিন্তু হোড়-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জল নিয়ে ফের সেখানেই ঢোকে। ঐ বয়সের অন্য কেউ নেই, সে খবর নিয়েছি হরিশের কাছে। তবু এ প্রসঙ্গ তুলতে পারি নে। গ্রামের মধ্যে হাকিম মানুষ—আমার অফিসের এক ভেণ্ডারের মেয়ের সম্পর্কে আগ্রহ দেখানো চলে কেমন করে?

মনের উল্লাসে দয়ালহরিকে বললাম, আপনার বাড়ির রান্না কতই খেয়েছি, আমার এখানে খেয়ে যান আজকে। হরিশকে আপনি দিয়েছেন, কী রকম করছে একটা দিন পরখ করে যাওয়াও তো উচিত। একেবারে খেয়েদেয়ে যাবেন এখান থেকে, আসুন

ততক্ষণ গল্প-সল্প করা যাক। হরিশ বরঞ্চ এক ছুটে আপনার বাড়ি খবর দিয়ে আসুক।

দয়ালহরির বড় সঙ্কোচ। সেটা বুঝতে পারি—আমি এজলাসের চেয়ারে-বসা হাকিম, ওঁর আসন রোয়াকের উপরের মাছুর। বড্ড না-না করছেন। তখন আমি হাত ধরে ফেললাম: রোজ মিষ্টি-মিঠাই খেয়ে একদিন নিম-উচ্ছে খেতে হয়। দেহের পক্ষে ভাল। আসুন, আসুন। হরিশের রান্না তা বলে নিমের মতন অত কটু হবে না।

অগুন্তি ঘর গোলবাড়িতে। মাখন মিত্তির তার চার-পাঁচটা মনের মত করে মেরামত করিয়েছিল। আমি সামনের গোলঘরটা মাত্র নিয়েছি। শোওয়া-বসা সমস্ত সেখানে। ঘর বেশি নিলে সাফ-সাফাই রাখবার হাঙ্গামা। আর হরিশ লম্বা দরদালানের এক পাশে ইট দিয়ে উনুন গেঁথে নিয়েছে। আগে তার শোবার ঘরও ছিল ওখানে, ইদানীং শুধুমাত্র রান্নাঘর। সন্ধ্যার পরে রাঁধতে রাঁধতে ঘরের ভিতর সে আমার মুখ দেখতে পায়। এঘরে ওঘরে কথাবার্তাও চলে। আজকে গোলঘরের খাটের উপরে দয়ালহরির সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছি। প্রবোধ দিচ্ছি তাঁকে: ভাববেন না, মেয়ের বিয়ে আটকে থাকবে না। ওই যে আপনারা বলে থাকেন, মেয়ে জন্মেছে যখন বর ব্যাটা জন্মে গেছে তার আগে। ঠিক তাই। বরঞ্চ ভালই হল অভদ্র লোকগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে।

দয়ালহরি অবাক করে দিলেন: ছেদ আর কোথায় হল হুজুর, ঝুলছে এখনও। ভেবেছিলাম তাই বটে। কিন্তু অত কথা-কথান্তর, কিছুই ওরা গায়ে মাখে নি। বিকেলে ওদের লোক কাছারি এসে দেখা করে বলে গেল, সাত-শ অবধি নামতে রাজি। বাড়ির লোকজন ছ্যাঁচড়ার বেহদ্দ। বিশেষ করে বাবরি-চুলওয়ালা সেই লোকটা—পাত্রের খুড়ো হলেন তিনি। তবে যাই বলুন হুজুর, পাত্রটি লোভনীয়। কী বলেন? কিন্তু সাত-শই বা কি জন্যে দেব? আরও নামবে। নেমে শূন্তিতে আসুক, তখন দেখব। সেটা

আর ভাঙলাম না। বললাম, দেখি ভেবে। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকতে মেজাজ দেখাতে নেই। কাল ভুল করেছিলাম, আজ অনেকটা শুধরে নিয়েছি।

হতে হতে এর পর দয়ালহরির সংসারের কথা। এবং সেই থেকে লাবণ্যর কথা। আহা, জন্ম থেকে কী কষ্টটা পাচ্ছে। কষ্ট আঁতুড় থেকেই। আঁতুড়ঘরে আগুন লেগে যায়। মেয়েটাকে যা-ই হোক উদ্ধার করা গেল, মেয়ের মা'র সর্বাঙ্গ পুড়ল। অনেক কষ্টে বিস্তর চিকিৎসাপত্তোর করে প্রাণটা বেঁচেছে। কিন্তু শুধুমাত্র আগুনে পোড়া নয়—হাপানি গেঁটেবাত অম্লশূল আরও বিশখানা, রোগ বড় বউয়ের। শরীরটা ব্যাধির কারখানাবিশেষ। দশ-পাঁচটা মাইনের ঝি-চাকর নেই, সংসারের কাজকর্ম সমস্ত করতে হয় এই অবস্থার মধ্যে। কষ্ট দেখে মেয়ের দিদিমা নাতনিকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, লাবণ্য যা হোক এক রকম ছিল, বুড়ি-অন্তে আবার দুঃখের দশা। ঠেলা-গুঁতো লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটানো। হতভাগী মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে একটু সুখশান্তি পায়, সেইজন্য এদেশ-সেদেশ সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দেখবেন তো হুজুর। মেয়ে কলকাতায় বড় হয়েছে, কলকাতার কোন পাত্র যদি পাওয়া যেত। কিন্তু এই ধাপধাড়া জায়গার লোকে নগদ সাত-শ হেঁকে বসে থাকে, কলকাতার ল্যাজে হাত দিতে যাই বা কোন্ সাহসে?

দু-পাঁচ কথার পরে আবার বলেন, ভুলবেন না হুজুর। নগদ পণ দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের পুরনো ঘর, গয়নাগাঁটি কিছু বেরোবে। ভাল ভাল গয়না দেব দু-পাঁচখানা। ওর মামা থাকতে কলকাতার সম্বন্ধ কয়েকটা এসেছিল, দেখেও গিয়েছিল ওদের চাঁপাতলার বাসায় এসে। তিনি ঘটক লাগিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল খারাপ, সে মামাও টপ করে মরে গেলেন।

ফোঁস করে দয়ালহরি নিশ্বাস ছাড়লেন। চাঁপাতলার নাম আমি তো বউদির চিঠিতে পেয়েছি—ডানাশূন্য পরী যেখানে

দেখে এসেছেন। হতে পারে এই লাবণ্য। ধরেই নিচ্ছি আমি তাই।

ধারা শ্রাবণ, তারপরে পচা ভাদ্র। ভাদ্র মাসটা বড় খারাপ। টিপটিপে বৃষ্টি, পথেঘাটে প্যাচপেচে কাদা, পাট-পচানি জলের গন্ধে সর্বক্ষণ নাকে কাপড় দিতে হবে। তার উপরে মশা। মশার ঠেলায় তাসের আড্ডা পুরোপুরি বন্ধ। হেন বীর কে আছে, সন্ধ্যার পরে মশারির বাইরে বসে থাকবে! ডাক্তারবাবুর রোগীর ভিড় সারা বছরই, কিন্তু এখন একেবারে নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। প্রতি বাড়িতেই রোজ একটা দুটো করে শয্যা নিচ্ছে। শীত করে জ্বর আসে, হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপুনি লাগে। লেপ-কাঁথা, কম্বল, শতরঞ্জি, মাদুর, মশারি বাড়িতে যত-কিছু আছে সমস্ত গায়ে চাপিয়ে শীত কাটে না, গলা দিয়ে উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ গান বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া। একেবারে খাঁটি বস্তু—তার প্রধান লক্ষণ, গান বেরুবে জ্বর আসবার মুখটায়।

দেখতে দেখতে এমন অবস্থা, মানুষের মুখ দেখতে পাই নে। দলিল রেজেস্ট্রি বাবদে কালে-ভদ্রে একজন দুজন আসে। এক ঘটি জল এগিয়ে দেবার সুস্থ মানুষ পাওয়া দায়, জমিজমা খরিদ-বিক্রির পুলক আপাতত ঠাণ্ডা। ভয়ে ভয়ে কুইনাইন ধরেছি। গোড়ায় এক বড়ি সকালবেলা, এখন সকাল-দুপুর-রাত্রি তিনবার করে চালাচ্ছি। ভাত বন্ধ করে শুধুমাত্র চা-কুইনাইনে পেট ভরাব কিনা ভাবি। তবু রক্ষা হল না, জ্বরে ধরল। প্রকোপ বড্ড বেশি। নতুন মানুষ, এ রোগে প্রথম এই পড়লাম—সেইজন্যে। অথবা ম্যালেরিয়ার যেন বোধজ্ঞান আছে, চোখ পাকিয়ে আমার টুঁটি চেপে ধরেছে: কুইনাইনে যে রুখতে গিয়েছিলি বড়? ঠেকাক কুইনাইনে। কাঁপতে কাঁপতে চৈতন্য হারাবার গতিক। কাঁপুনি থেমে শেষটা আগুন ছোটে গা দিয়ে। এ সমস্ত পরে শুনেছি হরিশের কাছে, আমার বোঝবার শক্তি ছিল না। দয়ালহরিও

বলেছেন। উনি প্রায়ই আসতেন। এ জায়গার মানুষ ভুগে ভুগে জ্বরের ধারা বুঝে ফেলেছে, গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। চিকিৎসা আবার কী—পনের-বিশ দিন ভুগে আপনি খাড়া হয়ে উঠবে। জ্বর বেশি হলে মাথায় জল ঢালুন, জ্বর কমলে কুইনাইন-মিকশ্চার খান। এ ছাড়া কিছু করণীয় নেই। তবে আমার বেলা ডাক্তারবাবু রোজ এসে দেখে যেতেন। বাড়াবাড়ির মুখে হরিশ রাত্রিবেলাও থাকত। মুখের কাছে জলের গেলাসটি এগিয়ে ধরা, বমি সাফ-সাফাই করা, ক্ষিধে পেলে নারিকেল-পাতা জ্বেলে তাড়াতাড়ি এক ঝিনুক বার্লি জলে ফুটিয়ে আনা—একজন কেউ না হলে এত সমস্ত করে কে? সকলের পরামর্শে হরিশ বউকে বাপের বাড়ি রেখে এসেছিল কয়েকটা দিন।

বেহুঁশ হয়ে প্রলাপ বকতাম। এমন কি, থানার বড়বাবু ছোট-বাবু দেখতে এসে একদিন দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। নৌকো পাঠিয়ে সদর থেকে বড় ডাক্তার আনার প্রস্তাব হল। কলকাতায় দাদাকে লেখার কথাও হচ্ছিল। ঠিকানা কোথায় পাওয়া যায়?

দয়ালহরি বললেন, আমি জানি। অসুখে পড়বার পর যত চিঠিপত্র আসে, আমিই এনে দিই। একলা প্রাণী পড়ে আছেন, বয়সে ছেলেমানুষ। দায়ে-বেদায়ে লাগতে পারে, তাই ভেবে সেরেস্তায় ঠিকানাটা টুকে রেখে দিয়েছি।

এ সমস্ত হরিশ আমায় পরে বলেছে। কিন্তু অতদূর আবশ্যক হল না। সেই রাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর রেমিশন হল। জ্বর এল আবার পরদিন, কিন্তু প্রকোপ বেশি নয়। এইবার কমতির দিকে চলল, ম্যালেরিয়ার রীতি এই।

আর ক'দিন পরে দয়ালহরিই বললেন, হুজুরের দাদার কাছে কিন্তু জানানো হয় নি।

ভাল হয়ে যাচ্ছি, আমিই জানিয়ে দেব ক'দিন পরে। খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন। খবর পেয়েই তো হুড়মুড় করে এসে পড়তেন, কোথায় থাকতেন, কী হত—

দয়ালহরি বললেন, আমরা এত জনে আছি, থাকবার জায়গার কি অভাব হত, পথে পড়ে থাকতেন? সেটা কিছু নয়। ভাবনা হল, ওঁরাও যদি জ্বরে পড়ে যান। পড়তেনও ঠিক। নতুন মানুষ পেলে ধরবেই। আপনার বেলা যা হল—এত কুইনাইন খেয়েও পারলেন রুখতে?

ভালই হয়েছে। দাদা-বউদিকে আর কিছু জানাচ্ছি নে। যাচ্ছি তো সামনের পুজোয়—তখন গিয়ে বলব। বলতে হবে না, চেহারা দেখে টের পাবেন। ছুটি নিয়ে দশ-পনের দিন বেশি কাটিয়ে শরীরটা মেরামত করে ফিরব।

জ্বর তাড়িয়ে ডাক্তারবাবু অবশেষে অন্নপথ্য দিলেন। আর দশজনের চেয়ে ভোগান্তি কিছু বেশি হল, এই যা।

শুনবেন তবে? অবাক হবেন না, অন্নপথ্যের দিন আমার খুব খারাপ লাগছিল। ওঁরা যাকে বলেন বেহুঁশ হওয়া, সে অবস্থা আসবে না তবে আর? মজায় থাকতাম জ্বরের যখন বাড়াবাড়ি হত। অতিরিক্ত কুইনাইন খেয়ে কানে তালা লাগে—হলপ করে বলছি, আমার সে বস্তু নয়—অনেকগুলো ক্ষীণ মধুস্বর বাজত কানে। তারযন্ত্রের অতি-মিহি সুরের বাজনা। অভিনব ঘরকন্না ছড়ানো যেন চারিদিকে—ব্যস্তসমস্ত এক দঙ্গল নরনারী। ফুটফুটে বললে কিছুই হল না, উজ্জ্বল দিনের আলোর মত তাদের চেহারা। এই গোলঘরের ভিতর দিয়ে কতবার আনাগোনা—কিন্তু আমি জলজ্যান্ত মানুষটা খাটের উপর পড়ে আছি, মেঝের উপরে আরও একজন হরিশ—কিছু ওরা দেখতে পায় না, কানেও শোনে না। এত চলাফেরা করছে, পা কখনও পড়ে না শক্ত ভূমির উপর, ক্ষীণতম শব্দ নেই। আমার গায়ের উপর দিয়ে আড়াআড়ি খাট পার হয়ে দেয়াল ভেদ করে কেমন স্বচ্ছন্দে চলে গেল, কোন-কিছু বাধে না কোথাও। অবাক হয়ে মজা দেখি, ইচ্ছে করে আমি ওই কায়দাটা পেতাম। এবং বিশ্বাস হচ্ছে, চেষ্টা করলে ঠিক পারব আমি, কঠিন কিছু নয়। অমনি হালকা আমিও হয়ে যেতে পারি।

এমনি সময় হরিশ হঠাৎ রসভঙ্গ করেঃ কী দেখেন হুজুর, অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে? ওষুধ খান। জল এনেছি কুলকুচো করে নিন আগে। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কী হয়ে গেল স্লেটের লেখা জলে ধুয়ে ফেলার মত। কিংবা সিনেমার রীল ছিঁড়ে গিয়ে সাদা পর্দা মাঝখানে বেরিয়ে পড়ে যেমন। সেই অবস্থায় হাত তোলার যদি শক্তি থাকত, ঠিক আমি মেরে বসতাম হরিশকে। লাঠি তুলতে পারলে এক বাড়িতে মাথা ফাটাতাম। তারপর সম্বিৎ ফিরে আসেঃ তাই তো, অসুখে ভুগছি আমি। কলকাতা থেকে অনেক দূরে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি। দাদা-বউদি কাছে নেই, টুনুও নেই। ভাগ্যবশে হঠাৎ বুঝি কোন রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, আমায় ওরা খাটো করে সামান্য সংসারে ফিরিয়ে আনল।

একদিন দয়ালহরির মেয়েকেও দেখলাম যেন ওই ফরসা মানুষের জনতার ভিতরে। কী নিয়ে লাবণ্যকে তাড়া করছে সমবয়সি ক'জন। একপিঠ চুল উড়ছে ছুটাছুটিতে, সদ্য স্নান করে এল বুঝি? এই রেঃ, ধরে ফেলল লাবণ্যকে, শাস্তিটা কী দেয় না জানি! হাসি—তুবড়িবাজির মত ঘরময় হাসির ফুলকি। আর কথা। উঁহু, কথা বলে না ওরা, গান গায়। সত্যি লাবণ্য, না অন্য কেউ? মাথায় গোলমাল লেগে যায় আমার। ঠিক করে কিছু ভাবতে পারি নে। যা হবার হোক গে। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলাম।

আরও একদিন। লাবণ্য আজ একা। বড় গম্ভীর, চোখ ছলছল করছে। আহা, আঁধার মুখও এমন খাসা! কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই ঘরের ভিতর! পেয়েছেও যেন—ছোট্ট ছোট্ট জিনিস, খুঁটে খুঁটে বাঁ-হাতের মুঠোয় রাখল। কিন্তু আমি এই এত বড় মানুষটা কিছুতে নজরে পড়ি নে। হাত উঁচু করে তুলেছি, চেঁচাচ্ছিও বোধহয়। কিছু না, দেয়াল পার হয়ে আমবাগানের দিকে ভেসে ভেসে বেরিয়ে গেল।

এমনি কত! এখন ভুলে গেছি। আরোগ্য হয়ে অন্নপথ্য

পেলাম—তার পর থেকে ভেবে ভেবেও আর মনে পড়ে না। শুধু ঘুম আসবার মুখটায়—যতক্ষণ ঘুম না এঁটে আসে—কত সব জায়গার ভাসা-ভাসা চেহারা দেখতে পাই। জ্বর বন্ধ হলেও উঠতে পারি নি অনেক দিন। ঢেঁকিতে চিঁড়ে কোটা দেখেছেন, আমায় যেন তেমনি করে গড়ের মধ্যে ফেলে আষ্টেপিষ্টে কুটে রেখে গেল।

হাকিম বিহনে রেজেস্ট্রি অফিসের কাজ বন্ধ ছিল কয়েকটা দিন। তার পরে সদর থেকে একজন এসে পড়ল। আমার চেয়েও বয়স কম। আপাতত এক মাসের জন্য এসেছে, আমি ভাল হয়ে উঠলেই চলে যাবে। ছোট দারোগার সঙ্গে কী রকমের শালা-ভগ্নিপতির সম্পর্ক—অতএব বাসার সমস্যা নেই, থানার কোয়ার্টারে এসে উঠেছে। প্রায়ই আমায় দেখতে আসে। বলে, খাড়া হয়ে উঠুন দাদা, আর তো পেরে উঠি নে—দম বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন করে থাকেন আপনারা বলতে পারি নে।

পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছে। আর আমার আজ এমনি গতিক, ঠেঙানি দিলেও নড়ছি নে বিরাটগড় থেকে। কেমন সব উল্টোপাল্টা আমার কাছে, অন্য দশজনের সঙ্গে মিলছে না। জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকতাম, সেই ঘোর কেটে যাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে এখন রীতিমত। ডাক্তারবাবু, দয়ালহরি এবং দারোগারা ষড়যন্ত্র করে তাড়াতাড়ি জ্বর তাড়িয়ে দিলেন। হিংসুটে ওঁরা, আমার অত সুখ সহ্য হচ্ছিল না।

চাপরাসি হরিশকে অফিসের সময়টা হাজির দিতে হয়। ফাঁকা দুপুর। অসুখের মধ্যেও দুপুর ছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিলাম না। তখনই আরও ঘর ভরে যেত জনতায়। একটা ভিন্ন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল যেন। সে জায়গা আলাদা কোথাও নয়, আমাদের এই সংসারেই ব্যেপে রয়েছে। এর চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিস্তীর্ণ। শুয়ে শুয়ে ওই দেখতে পাচ্ছি, পিঁপড়ের সারি চৌকাঠের পাশে বাসা গড়েছে। বারান্দার দিক থেকে খাদ্যের কণিকা বয়ে বয়ে এনে রাখছে। দুর্ভেদ্য নিরাপদ আশ্রয় ওদের। কিন্তু আমার

কাছে ? জুতোর তলায় লহমার মধ্যে পিষে ফেলতে পারি সমস্ত। উপমাটা লাগসই হচ্ছে না কিন্তু। পিঁপড়ে ওই তো নজরে আসছে। আণব প্রাণী, মাইক্রোব, ইন্দ্রিয়-সীমানার বাইরে যাদের বসবাস—অবাধে তাদের উপর বিচরণ করে বেড়াই, বুঝতে পারি নে। ঠিক তেমনি সম্পর্ক যেন আমাদের এবং সেই তাদের মধ্যে। রোগের বিছানায় হঠাৎ তৃতীয় নেত্র খুলে গিয়েছিল, সেই ক'দিনে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। শুধুমাত্র যুক্তিবিচারে অনুভূতি এমন গভীর হয় না।

এখন ভিন্ন অবস্থা। নিঃসঙ্গ। তারা তো বাতাসের মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার রক্তমাংসের স্থূল চেহারারও কেউ আসছে না। মানুষ কাজেকর্মে ব্যস্ত, কাজ ফেলে কে রোগীর কাছে বসে থাকবে ? একলা প্রাণী পড়ে থাকি ঘরের মধ্যে। মা-বাবা কবে চলে গেছেন, তাঁদের কথা ভাবি। ছোটবেলা থেকে যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারাও সব মনে আসে। পিছন ফিরে সেই বয়সটায় চক্কোর দিয়ে বেড়াই। কতজনে নেই তাদের মধ্যে! আরও যত বয়স হবে, মরা বন্ধুদের সংখ্যা বাড়বে ততই। আজকে কোথায় তারা সব—ভাবতে গিয়ে থই পাই নে।

যত মরা মানুষের কথা ভাবি। দলে ভারী তারাই, জ্যান্ত আর ক'জন ? মরছে তো আজ থেকে নয়—সৃষ্টি-সংসারের শুরু যখন, সেই থেকে। আদমের আমল থেকে। উঃ, কী ভিড় সেই মরা রাজ্যে! ভাগ্যিস খেতে হয় না ওদের, বায়ুভূত বলে জায়গাও লাগে না! নইলে তো লড়ালড়ি বেধে যেত। আমিও আর একজন ভিড় বাড়াচ্ছিলাম তাদের মধ্যে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ডাক্তারবাবু বলেন, একদিন বড় ক্রাইসিস—ভয় হয়েছিল তাঁর। টেম্পারেচার হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। বেহুঁশ। নাড়ির বেগ মণিবন্ধে নয়, বাহু অবধি উঠেছে। তারপরে সামলে নিলাম। এমনি অসুখ-বিসুখের সময় মায়ের কোলের ভিতর বাঁকা হয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম সেকালে—রোগ হওয়াটা সত্যি

বড় আরামের ছিল। আজকে ধরুন, সেই মা মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ালেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কিংবা এসে গেল প্রভাস—ছেলেবেলায় আমার সর্বক্ষণের সাথী। ঠিক দুপুরবেলা মগডাল থেকে পড়ে গেল, সন্ধ্যা হতে না হতে মাদুরে মুড়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে শ্মশানঘাটে নিয়ে পোড়াল। সেই প্রভাস যদি এতকাল পরে খবরাখবর নিতে চলে আসে এই ঘরের মধ্যে? অথবা ঝিকমিকে এক কিশোরী—কি নাম তার? মায়া বোধহয়। ভোজ খাচ্ছিলাম উঠানে সামিয়ানার নীচে। কাজের বাড়ি অনেক আত্মীয়কুটুম্ব এসেছে, তাদেরই কেউ হবে মেয়েটি। বাংলা-ঘরে বাঁশের খুঁটির পেলা—সেই একটা খুঁটির গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াদাওয়া দেখছিল। উঠতি বয়স তখন আমার—ঠিক একখানি প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে, এমনিধারা মনে হল। সে রাতে ঘুম হয় নি অনেকক্ষণ, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করি। মায়া এসে বসুক আমার কাছে, দুটো কথা বলে যাক। তারপরে শুনেছিলাম, নদীতে চান করতে গিয়ে কুমিরে ধরেছিল মায়াকে। ঘাটের জলে খানিকটা রক্ত, আর কোন চিহ্ন মেলে নি। না রে ভাই, কাজ নেই—বলছি, কাজ নেই তাদের কারও ফিরে আসবার। চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে গেছে তো সেই পরিচ্ছেদ আবার কেন?

বরঞ্চ দয়ালহরির মেয়ের এসে দেখে যাওয়া উচিত। বিদেশ-বিভুঁয়ে একলা পড়ে আছি—কলকাতায় মানুষ হয়ে সৌজন্যবোধ কেন থাকবে না? ব্যবধান তো একটা মাঠের এপার আর ওপার। আম কুড়োবার সময় ভোররাত্রে উঠে আসা যায়, আর নিরালা দুপুরে দরজায় দাঁড়িয়ে একটিবার চোখের দেখা চলে না?

ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠি। বিছানায় পড়ে থাকতে পারি নে। বাইরে যাব, চৌকাঠ পার হয়ে যাই নি কতদিন! কিন্তু পা টলমল করে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারি নি। জানলার চাতালে তাড়াতাড়ি বসে পড়তে হয়। গরাদে

আঁকড়ে থাকি দু-হাতে প্রাণপণে। মাথা ঘুরে পড়ে না যাই। গোলবাড়ির পুকুরে লাবণ্য জল নিতে আসে না বোধহয় আজকাল। বর্ষার পরে হোড় মশায়ের বাড়ির পুকুরই জলে টইটম্বুর, দূরের জল বয়ে নেবার কী গরজ? আরও বিপদ, ওদের বেড়ার জিওল-গাছে পাতা গজিয়েছে—সবুজ পাতার বোঝায় বাইরে-বাড়ি ঢেকে গিয়েছে একেবারে। সারাক্ষণ নজর মেলেও কিছু দেখতে পাই নে।

অফিসের ফিরতি পথে দয়ালহরি খবরবাদ নিতে আসেন। চিঠিপত্র থাকলে দিয়ে যান। আগে রোজই আসতেন, এখন দুটো একটা দিন ফাঁক যায়।

কেমন আছেন?

একটু ভাল। ক্ষিধেটা খুব হয়েছে।

তবে তো পনের আনা সেরে গেছে। ক্ষিধে বেড়েছে, আর ভাবনা নেই।

দেহ যত দুর্বল হোক, মাথা আমার ষোল আনা সুস্থ। শুকনো মুখে বলি, ভাবনা বরঞ্চ বেড়েই গেছে। ক্ষিধে পায় একটা-দুটোর সময়। কী খাই কী খাই অবস্থা। যম-ক্ষিধে যাকে বলে।

হরিশ অনেক আগে ফিরেছে। বাসন ধুচ্ছিল রোয়াকে বসে। সেখান থেকে হাঁ-হাঁ করে ওঠে: অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবেন না হুজুর। এত বড় ভোগান্তি গেল। ক্ষিধে পায় তো খাবেন। টিনের বিস্কুট রয়েছে।

কথা কেড়ে নিয়ে দয়ালহরি বলেন, কমলানেবু আনিস নে কেন রে? আজকাল বারো মাস পাওয়া যায়। তোরা না পারিস, আমায় বলবি। সদর থেকে আনিয়ে দেব। কত মানুষ যায়, হুজুরের নাম করে বলে দিলেই এনে দেবে।

আমি বললাম, কী ভয়ানক ক্ষিধে—নেবু-বিস্কুটে তার কী হবে? মালসাখানেক বার্লি-সাবু গিলতে পারলে তবে বোধহয় সে আগুন ঠাণ্ডা হত।

হরিশ বলে, তাই হবে। আমায় আগে বলেন নি। কাল থেকে বার্লি ফুটিয়ে ঢাকা দিয়ে যাব।

হেসে বলি, তবেই হয়েছে। মিছে কষ্ট তোকে করতে হবে না। ঠাণ্ডা বার্লি খাইয়ে দেখিস নি এর আগে? বমি হয়ে যায়। এক গুণ খেলে তিন গুণ বেরিয়ে আসে। গরম-গরম হলে তবে গিয়ে পেটে ভর থাকে।

হরিশ নিরুপায়ের মত মুখ করে থাকে। দয়ালহরির দিকে আমি সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়েছি। কথা তো ছুঁড়ে দিলাম, কী রকম ফলাফল হয় দেখি। কিছু না, কিছু না। ঝানু লোক—তাঁর যে এ ব্যাপারে কিছু করণীয় থাকতে পারে, কোনক্রমে তা মনে আসছে না। ইচ্ছে হলে তিনিই বার্লি-সেবনের ব্যবস্থা করতে পারেন। হরিশকে দিয়ে কৌটো কৌটো বার্লি আমি হোড়বাড়ি পাঠিয়ে দেব, জলে ফুটিয়ে দুপুরবেলা বাটিখানেক করে ওঁরা পাঠাবেন। ঝি-চাকর রাখবার অবস্থা দয়ালহরির নয়। সে আমি জানি। এবং এ-ও জানি, লাবণ্যের জন্মের সময় বড়বউ অগ্নিদগ্ধ হলেন, পা দুটো একেবারে পঙ্গু সেই থেকে। দু-হাতে ভর দিয়ে ব্যাঙের মতন থপ থপ করে বাড়ির মধ্যে কোন গতিকে বেড়ান। মাঠ ভেঙে বার্লি দিয়ে যাবার তাগত বড়বউয়ের নেই। কিন্তু তালগাছের মতন মেয়েটা আছে কী করতে? স্ফূর্তি করে আম কুড়িয়ে বেড়াতে পারে, রোগি মানুষের ক্ষিদের সময় এক বাটি বার্লি দিয়ে যেতে পারবে না? কিন্তু ভাবছে কে এতসব? আমার কথা কানেই গেল না তো দয়ালহরির।

বরঞ্চ হরিশ বেশ চিন্তিত। পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় বলল, একটা কথা ভাবছি হুজুর। আমার পিসশাশুড়ি বেওয়া মানুষ আছেন, দায় জানালে তিনি এসে দু-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পারেন। থাকবেন আমার বাড়ি, দুপুরবেলাটা এসে পথ্যি রেঁধে দেবেন। কি অন্য যদি কোন দরকারে লাগে। রবিবারের আর

দুটো দিন—এই দুটো দিন থাকুন কষ্ট করে বিস্কুট চিবিয়ে। রবিবারে গিয়ে তাঁকে এনে ফেলব।

হরিশ অফিসে গেল। তারপরে আমি একা। খাতা-কলম নিয়ে বসলাম অনেকদিন পরে। দু-চার ছত্র এসে যায় যদি। দূর! বই পড়তে গেলাম। পাতাখানেক পড়ে মনে হল, চোখ দিয়ে পড়ছি শুধু, কি ছাইভস্ম পড়লাম মনে ঢোকে না। চিঠি ফেঁদে বসলাম একখানা। খানিকটা টুনুকেঃ অনেক খেলনা কিনেছি তোমার জন্য। এক গাদা। পুজোর সময় নিয়ে যাব। বউদিকে লিখলামঃ চারিদিকে জ্বরজারি। সে যে কী অবস্থা, কলকাতায় বসে তার কোন আন্দাজ পাবে না। কিন্তু কুইনাইনের কল্যাণে আমি ঠিক আছি। কেবল কান ভোঁ-ভোঁ করে। সে ভারি মজা। ঝিঁঝি ডাকছে কোথায় অনেক দূরে। অথবা কার বাড়ি বিয়ে হচ্ছে যেন, সানাই বাজছে, আওয়াজটা বড্ড মিহি। বউদি, নিখরচায় ভাল সানাই শুনবে তো কুইনাইন ধর…

অনেকটা লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মাথা দপ-দপ করছে, শীত লাগছে। এই রেঃ, জ্বর আসে বুঝি! এই অবস্থায় লেখার খাটনি খেটে জ্বরটা আমিই আবার নিয়ে এলাম ডেকে। ডাক্তারবাবু শুনলে খাপ্পা হবেন। চাদর মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে পড়লাম। ঘুমোই। ঘুমিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাব।

কতক্ষণ পড়ে আছি, বলতে পারি নে। আঙুলে রগ টিপে আছি, কষ্ট আরও বেড়েছে। তখন মনে হল, অডিকলোনে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কপালে পটি দিই। অডিকলোন দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, উঠে নিয়ে আসি। মুখের চাদর সরিয়ে দেখি—

সে ছবি কোনদিন ভুলব না। এত কাছাকাছি কখনও পাই নি, এমন ভাল করে আর দেখি নি। আমার শিয়রের পাশে এসে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ধবধব করছে ফরসা রং। দুধের মত— উঁহু, জ্যোৎস্নার মত। জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ আমেজ মাখানো। আমার সামনে দয়ালহরি চুপচাপ মুখ বুজে ছিলেন, বাড়ি গিয়ে

ঠিক গল্প করেছেন আমার অসহায় অবস্থার কথা। মেয়ের কী মন হল—বার্লি নেই তো খালি হাতে চলে এসেছে। কে চায় বার্লি খেতে—বার্লি তো আমার পেটেই দাঁড়ায় না, ওয়াক করে বমি করে ফেলি। আর ওই কানা লোকগুলোর কথা ভাবছি—এক কানা হলেন দয়ালহরি, আর কানা ষষ্ঠীপুকুরের বাঁদর-চতুষ্টয়, যারা মেয়ে দেখতে এসেছিল। হরিশও কানা। নয়তো এই মেয়ের চেহারা নিয়ে কথা বলে। আচ্ছা, রোগাতুর দৃষ্টি বলেই কি আজকে আমার এত সুন্দর লাগে ?

তাকিয়ে পড়তে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, কষ্ট হচ্ছে ?

না, না—বেশ তো আছি।

মিথ্যাও নয় জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দরদ জানাবার পর ? এতক্ষণের আহা-উহু চক্ষের পলকে গানের মতন সুরেলা হয়ে উঠছে।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায় ঃ আজকে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে—কেমন ?

হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ বুঝলাম। হরিশ এসে পড়েছে। রাস্তায় দূরে তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পালাল।

মুখ কালো করে হরিশকে বলি, এত সকাল সকাল ?

নতুন হুজুরকে বললাম আপনার কথা। গিয়ে বার্লি রেঁধে দেব। বলতেই তিনি ছুটি দিয়ে দিলেন।

কে খাচ্ছে তোর বার্লি ? হয়েছে কী আমার ? আমার কথা কী জন্যে বলতে গেলি তাঁর কাছে ?

রাগ দেখে হরিশ হকচকিয়ে যায়।

ছুতো করে পালিয়ে আসা। সরকারের মাইনে খাস না যে যখন-তখন চলে এলেই হল ?

হরিশ আস্তে আস্তে বলে, রোজ তো নয়। এই আজ হল, আর কালকের দিনটা। পরশু তো পিসিমাকে নিয়ে আসছি।

কাউকে আনতে হবে না তোর। ওই এক মতলব হয়েছে। জানিস যে, বার্লি খেতে পারি নে, বমি হয়। রোগা শরীরে বমি করতে করতে চোখ উলটে পড়ব। সেইটে না ঘটিয়ে ছাড়বি নে।

হরিশ সরে গেল। লাবণ্য কথা রেখেছে। সেই থেকে রোজ দুপুরে চলে আসে। কথাবার্তা অতি সামান্য, কোনদিন একেবারেই নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। তা-ও সামান্যক্ষণ — দু-পাঁচ মিনিট। ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল, হপ্তা দুয়েকের মধ্যে একেবারে নিরাময়। গ্রাম-অঞ্চলে সাধু-ফকিরেরা ঝাড়ফুঁক দিয়ে ব্যাধি সারায়। ডাক্তারবাবু যত ওষুধই দিন, আমি জানি, দু চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে লাবণ্যই আমার জ্বর সারিয়ে দিল।

জ্বর বন্ধ হবার পরে কালে-ভাদ্রে কদাচিৎ দেখা পাই। নতুন হিম পড়ছে। দুটো একটা মাস এখন খুব সামাল হয়ে থাকতে হবে, ডাক্তারবাবু পই পই করে বলেন। ঠাণ্ডা লাগানো বিষের মত শরীরের পক্ষে। এবং শীতকালে আবার যদি জ্বরে পড়েন, যত ওষুধই খান, জের চলবে ফাগুন-চৈত্র অবধি।

বললেন, স্থানপরিবর্তনে উপকার হয়। আর কোথাও সুবিধা না পান, পুজোর সময়টা কলকাতায় থেকে আসুন, তাতেই কাজ হবে। আমি কিন্তু আগে-ভাগে উল্টোরকম লিখে দিয়েছি: বনেদি গ্রাম, দশ-বারোখানা প্রতিমা উঠবে, এখন থেকে সোরগোল পড়ে গেছে। গ্রামের বাসিন্দা যে যেখানে থাকে, সকলে এই সময় এসে পড়েছে। সারা গ্রাম এক হয়ে গেছে উৎসবের আনন্দে। সব বাড়ি নিমন্ত্রণ—যে-কোন এক জায়গায় খেয়ে নিলেই হল। এই কাণ্ড চলল এখন শ্যামাপুজো অবধি। চাঁদা তুলে প্যাণ্ডেলের সর্বজনীন পূজা আর কানে-তালা-ধরানো মাইকের অট্টরোলের মধ্যে এই বিরাটগড়ের দুর্গোৎসব তোমার ধারণায় আসবে না বউদি। গ্রামসুদ্ধ মিলে ধরাধরি করছে, কিছুতে এখন আমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে দেবে না। শীতকালে বড়দিনের সময় নিশ্চয়

যাব, ওই সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে। ছুটি অনেক জমেছে।

দয়ালহরি গল্প করেছিলেন সেকালের বিরাটগড়ের—পুজোর সময় গাঁয়ের যে-রকম বাহার খুলত। সেই বর্ণনা হুবহু লিখে দিলাম চিঠিতে। সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পুজোর সময় এবারে ঢাকের বাড়িটাও পড়ে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি এখন নড়তে পারব না। দাদা-বউদিকে ধাপ্পা দিচ্ছি—সে না-হয় হল—ভাবতে অবাক লাগে, টুসুমণিকে অবধি ভুলতে বসেছি।

ডাক্তারবাবুর কাছে সাফাই গাই: শরীরের এমন দশা, এক পা নড়তে মাথা ঘোরে। নৌকো-ট্রেনের অত ধকল সয়ে কলকাতা অবধি আমার পৌঁছনো ঘটবে না, পথে কোনখানে পড়ে মরব।

পুজোর মুখে নতুন সাব-রেজিস্ট্রার চলে গেলেন। একরকম পালিয়ে যাওয়া। বিরাটগড় ছেড়ে বাঁচলেন যেন ভদ্রলোক। ছুটির পরে আমায় অফিস করতে হচ্ছে। বেশি খাটি নে, বেলাবেলি বাসায় ফিরে আসি। ডাক্তারবাবুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করি, ঠাণ্ডা লেগে আবার যদি অসুখে পড়ি নির্ঘাত মারা যাব এবারে।

সন্ধ্যা হতে না-হতে দুয়োর ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি। কিছু গানের চর্চা ছিল, সে তো জানেন। গলার সুরের জন্য তারিফ পেয়েছি এক বয়সে। সময় কাটানোর জন্য একটু-আধটু গানও শুরু করেছি। এক অভাবিত সুবিধা হয়ে গেল। দয়ালহরি শুনেছেন বুঝি একদিন—বললেন, খালি গলায় কেন হুজুর? লাবণ্যর হারমোনিয়াম আছে, ও গাইতে চায় না। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, বলেন তো সেইটে আনিয়ে দিই।

নিজেই ঠিক বয়ে আনতেন। কিন্তু আমি চটে যাই বলে হরিশকে নিয়ে গেলেন। হারমোনিয়াম এসে পড়ল। বাজারের ফঙ্গবেনে বস্তু নয়। দেখে আমি অবাক। কলকাতায় মল্লিকদের বাড়ি এই রকম জিনিস দেখেছিলাম। তাঁরা বনেদি গৃহস্থ, সঙ্গীতের

পৃষ্ঠপোষক তিন-চার পুরুষ ধরে। ওঁদেরই কে বিলেত থেকে আনিয়েছিলেন। ঠিক এই বস্তু কি না, বলবার মত জ্ঞান নেই। কিন্তু চেহারাটা এমনি।

এ জিনিস কোথায় পেলেন হোড় মশায় ?

ভাল জিনিস ? কী জানি, আমি বুঝি নে। লাবণ্যর দিদিমার কাণ্ড। তাঁর শখ ছিল অনেক। নাতনিকে গান-বাজনা শিখিয়ে হাল ফ্যাশানের বানাবেন। শহুরে ছেলে দেখে বিয়ে দেবেন। মরে গেলেন তিনি। মরবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশান মাথায় উঠে গেল। তাই ভাবলাম, অব্যবহারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে—মেয়ের হল না তো গুণীজনের কিছু কাজে আসুক।

নাড়াচাড়া করে দেখে বলি, এর তো অনেক দাম।

দয়ালহরি একটু থতমত খেলেন মনে হল। অবহেলার ভাবে বললেন, দাম না হাতী ! দাম হলে কি জোটানো যেত ! আমায় যারা জামাই করেছিল, বুঝতেই পারেন, তারা রাজা রাজবল্লভ নয়। শাশুড়ি পেয়েছিলেন কোথায় সস্তায়। ওঁদের চাঁপাতলার বাসার কাছেই হল চোরাবাজার। সস্তায় অনেক জিনিস পাওয়া যায়। দাম-টামের কথা জানি নে, আমায় কেউ কিছু বলে নি।

বাজিয়ে দেখছি। কী করে রেখেছে জিনিসটা ! বেলোর চামড়া আরশুলায় কাটা। কেশো রুগির মত ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোয়। রীডগুলো যেন বুড়ো মানুষের নড়া দাঁত—সাবধানে টিপতে হবে, নয়তো খুলে পড়ে যেতে পারে। তা হোক, তবু লাবণ্যর জিনিস। অনেক দাম আমার কাছে।

আপনার মেয়ে গান-টান শিখেছে কিছু ?

উঁহু, একেবারে নয়। শাশুড়ি ঠাকরুন বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না। ভাগ্যিস শেখে নি। একটু-আধটু লেখাপড়া জানে বলে ষষ্ঠীপুকুরের ওরা কাঁইকুঁই করছিল : কলম পিশতে হবে না মশায়, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানতে জানে কি না তাই বলুন। গানের কথা টের পেলে রক্ষে ছিল ? বলত, বাইজি বউ ঘরে

নেব—একশ-এক টাকা বাড়তি ধরে দিতে হবে গানের খুঁত ঢাকবার জন্য। জানেন না হুজুর, আমাদের নচ্ছার পাড়াগাঁয়ের গতিক।

আওয়াজ যেমনই হোক, লাবণ্যর হারমোনিয়াম। চাঁপার কলির মত আঙুল ঘুরে বেড়িয়েছে রীডের উপর দিয়ে, বাঁ হাতে আলসে লাবণ্য বেলো টেনেছে। বিরাটগড়ের ভারি সব সমঝদার মানুষ কিনা! এই বাজনার সঙ্গে আমার গান খাসা মিলবে। আমার গলার সুর আর লাবণ্যর বাজানো হারমোনিয়াম।

ডাক্তারের সব কথা কে কবে মেনে চলতে পারে? সন্ধ্যার পর বাসা থেকে না বেরুলেই হল। দুয়োর-জানলা এখন খুলে দিই—গলাও খুব দরাজ হয়েছে, গাঁ-গাঁ করে গীত অভ্যাস করি। গানে নাকি বনের পশু বশ মানে। হয়তো তাই। কিন্তু যেসব মানুষ শহরে থেকে এসেছে, তারা কদাপি নয়। বন্য পশুর বেশি বেয়াড়া শহরে-থাকা মানুষ।

মরীয়া হয়ে একদিন চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথা: গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল, একটিবার এক লহমার জন্যে তবু দেখা মেলে না। অসুখের সময় রোজ আসা হত। তবে তো অসুখই ভাল। রোজ আমি দরজা-জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগাই, ভাগ্যবশে আবার যদি অসুখ করে। আবার তবে আসবে একজন।

চিঠি তো লেখা হল—পাঠানো যায় এখন কেমন করে? কার হাত দিয়ে? হরিশকে দিয়ে হবে না। হাকিমের কাণ্ড দেখে মনে মনে সে কী ভাববে? এহেন রসাল ব্যাপারের ভাগ নতুন বিয়ের বউকে না দিয়ে পারবে না। বউকে বলে মানা করে দেবে: খবরদার রা কাড়বে না মুখে। তার অর্থ, গ্রামময় জানাজানি। পড়তে লিখতে শিখে বেটা বিপদ ঘটিয়েছে।

হোড় মশায়ের জিওলগাছে আবার পাতা ঝরতে শুরু হয়েছে। দূর থেকে হাড়গিলে দেবীর কখনো-সখনো দর্শন মেলে। বারান্দায় বসে সকালে রোদ পোহাচ্ছি। হরিশ ওদিকে রান্নার কাজে ব্যস্ত।

রাস্তা দিয়ে এক রাখাল ছোঁড়া ছাগলের পাল নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডাকলাম, এই, শুনে যা একটা কথা—

সিকি হাতে দিয়ে বললাম, পানের বরোজে টাটকা তোলা পান পাওয়া যায় এখন সকালবেলা। দু-আনার পান কিনে দিয়ে যা তো তাড়াতাড়ি। বাকি দু-আনা তুই নিয়ে নিবি।

মোটা মুনাফা পেয়ে ছোঁড়ার মুখে হাসি ধরে না। সিকি মুঠোয় পুরে চলে যাচ্ছে—

আর দেখ্, উই যে দেখতে পাচ্ছিস—

অধীর হয়ে সে বলে, পানের বরোজ আমি জানি।

গাঁয়ের মানুষ তোরা আবার কোন্‌টা না জানিস? বাইরে থেকে এসে আমরাই বরঞ্চ কিছু জানলাম না। হোড় মশায়ের বেগুনক্ষেতে একজন ওই বেগুন তুলে তুলে বেড়াচ্ছে—দেখতে পাচ্ছিস তো—ওকে এই কাগজটা দিবি। কী বলে, শুনে আসবি তার কাছ থেকে।

ছোঁড়া চলল। ছাগলগুলো পথের এদিকে সেদিকে ঘাস খুঁটে খাচ্ছে। আছি একনজরে তাকিয়ে ওদিকে। অজানা মেয়ের নামে প্রথম এই চিঠি—সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আর কখনও এমন কর্ম করি নি। চিঠি পাঠানোর পর বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে, না জানি কী ঘটে। ওই তরফের আগ্রহ দেখে তবে তো আমি লিখেছি চিঠি। ক্ষণ পরে দেখলাম, রাখাল ছোঁড়া দৌড়চ্ছে। আলের পথে নয়, আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এল। দম নিতে পারে না।

খবর কী রে?

পান দিল না। বরোজ থেকে বিক্রি হয় না। হাটে গিয়ে কিনতে হবে।

আর সেই কাগজ?

গোখরো-সাপের মতন ফোঁস করে উঠল বাবু। কাঁটাসুদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারল আমার দিকে।

মেয়েলোকের ভয়ে মরীয়া হয়ে ছুটেছিস? কী রকম বেটা-ছেলে রে তুই?

এমন কথার উপর কোন্ বেটাছেলের না লজ্জা হয়। হলই বা বয়সে ছোট। বলে, মেয়েলোকের ভয় কেন হবে বাবু? বুড়োও দেখি 'কী—কী হয়েছে' করে ক্ষেতের দিকে আসছে। তখন আমি সরে পড়লাম।

উদ্বেগ, আবার দয়ালহরিকে বলে-টলে দেয় নাকি? পুরো সিকিটাই বখশিশ হিসাবে দিয়ে বিদায় করলাম—গোখরো-সাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। সারাদিন মনে নানারকম তোলাপাড়া করেছি। অফিস থেকে ফিরে দেখি, ঘরের মেঝেয় একখানা আঁটা খাম। জানলা দিয়ে কেউ ফেলে গেছে। রাখাল ছোঁড়ার উপর বেগুন ছুঁড়তে গিয়েছিল, আমার উপরে চিঠি ছুঁড়েছে।

অতি সংক্ষিপ্ত দু-ছত্রের চিঠি। লিখেছে, কোনও দিন কোন-খানে যাই নি আমি। মিথ্যে কথা লিখে চিঠি পাঠানোর হেতু কী?

আস নি তুমি—মিথ্যে কথা? তাই তবে মেনে নিলাম। আমারই চোখের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। হাত-খানেক দূর থেকেও চোখের ভুল। কাগজের উপর তাই আবার লিখে জানিয়েছে। বেশ!

দু-দিন পরে আবার তেমনি এক চিঠি পড়ল: আগের চিঠি অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। একশ-পাঁচ জ্বর শুনে গিয়েছিলাম একদিন। একটা দিন মাত্র, মিনিট খানেকের জন্য। বাইরে থেকে এক নজর উঁকি দিয়ে আসি। রোজ যেতাম, এমন কথা কী জন্য তবে লেখা হয়? ছোট্ট এক ব্যাপার নিয়ে চিঠি চালা-চালিরই বা কী দরকার?

আবার ক'দিন পরে পুনশ্চ চিঠি: না হয় গিয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশি মানুষ একলা রোগে ছটফট করছেন, কানে শুনে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে এসেছি,

ঘরের ভিতর যাই নি তো। বাবার কানে না ওঠে, দোহাই আপনার। গল্প করতে করতে বলে বসবেন না। আপনার চিঠি যখন এনে দিল, বাবা এমনিই খানিকটা দেখে ফেলেছেন। আজে-বাজে কথা বলে আমি চাপা দিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়ছি—চোখ তুলে দেখি, লেখিকাই অদূরে ঘনপক্ষ্ম ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মুচকি মুচকি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত খেলানো হচ্ছে কেন ?

মজা—

চিঠিতে যা লিখেছি, মুখেও এসে পড়ে আবার তাই : বাসায় যতক্ষণ থাকি, একা একা বড্ড কষ্ট হয়। অসুখই ভাল ছিল আমার।

হেসে হেসে এক আশ্চর্য চাউনি চেয়ে সে বলে, অসুখ তো এখনই। বারোমেসে যাপ্য ব্যাধি। জ্বরের ওই ক'টা দিনই ভাল হয়ে গিয়েছিলেন কপালক্রমে।

খিলখিল করে হেসে উঠল। আজব কথা বলে, হেঁয়ালির ভাষা। বলে, রংমহলে রূপের মেলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়েছেন তার একটুখানি। কয়েকটা দিনে সামান্য একটু দেখে-ছেন। আর ডাক্তারে বলে কিনা ভুল দেখছে, প্রলাপ বকছে!

আপনাদের কাছে আবোল-তাবোল, কিন্তু আমার মনের সঙ্গে লাবণ্যর কথা অদ্ভুত রকম মিলে যায়। জানল কী করে? এ মেয়েরও অসুখ করেছিল—আমার মতন অমনি সব দেখেছে? অসুখে-বিসুখে চেতনা স্তিমিত হয়ে যায়—আরে দূর, কী বলে বসলাম! একেবারে উল্টো। নবচেতনা জাগে সেই সময়, প্রখর দৃষ্টি খুলে যায়। রংমহল বলছে লাবণ্য—ভারি উজ্জ্বল সেই মহলের রং, বড় স্নিগ্ধ। বাসিন্দাদের হালকা চলাফেরা, এতটুকু আওয়াজ হয় না। মজার সংসার ওদের। হাসি আর আনন্দ। সেই কয়েকটা দিনে আমি আঁচ পেয়ে গেছি। তারপরেই পর্দা পড়ে গেল।

শুধু একটু চোখের দেখায় সুখ হয় না লাবণ্য। রংমহলে ঢুকতে পারি কী করে সেইটে বল।

সাহস থাকলেই পারা যায়। আধ মিনিটও লাগে না। ভীরুরা পেরে উঠে না।

হেঁয়ালির মতন জবাব দিয়ে রহস্যভরা চোখে চেয়ে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে। কী বলল, কিছুই মাথায় ঢোকে না। দেখি, পথের উপরে হরিশ। আর-কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে সময় নেই। আমি আগে চলে আসি, তারপর সেরেস্তাদারবাবু কাগজপত্র গুছিয়ে বেরোন। হরিশ অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ করে হাটখোলাটা ঘুরে সংসারের এটা-সেটা সওদা করে নিয়ে আসে। আজকে বোধহয় হাটখোলায় দরকার ছিল না।

বলে দিলাম, আবার আসবেন কিন্তু। কাল। ভুলে যাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে লাবণ্য ঘাড় নাড়ল। তারপরে আমতলা দিয়ে পাঁচিলের বাইরে কোন্‌দিকে চলে গেল, আর দেখলাম না। বাড়ি ফিরল না এখন, তবে তো ফাঁকা মাঠের উপর আলপথে বাবলাবনের পাশে পাশে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেতাম।

পরের দিন বেশি সকাল করে ফিরলাম। লাবণ্যও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

কথা রেখেছেন তবে? এসেছি এই কত তাড়াতাড়ি দেখুন। কাজকর্ম সব চুলোয় গেল। হরিশ হতভাগার জন্যে। আজ ওকে বলে এসেছি, সেরেস্তাদারের সঙ্গে পাঁচটা অবধি থাকবে। এক মিনিট আগে অফিস ছাড়বে না। ততক্ষণ আমরা নিরিবিলি। আচ্ছা, আমি সকাল সকাল বেরুই শরীর খারাপের ছুতো করে। আপনি কী বলে বাড়ি থেকে বেরোন? আগে তো বিকালে জলের কলসি কাঁখে আসতেন, এখন কোন্ অজুহাত?

লাবণ্য অন্য কথা বলে, আপনি-আপনি করেন কেন আমায়? চেহারা দেখে কি মনে হয়, খুব ভারিক্কি হয়ে গেছি আমি? আদ্যি-কালের বদ্যি-বুড়ি?

সে কী কথা, বুড়ো হতে যাবেন কেন?—হেসে উঠে আবার বলি, বুড়ো আপনি কোনদিন হবেন না।

লাবণ্যও হেসে হেসে বলছে, কণ্ঠস্বরে তবু কেমন উদ্বেগের আভাস ঃ বলুন, বলুন না। আমায় দেখে বয়স বেশি মনে হয়? মুখের উপর জাল-জাল দাগ? দেখুন—নজর করে দেখে তবে বলবেন।

বুঝতে পারছি, থুবড়ো মেয়ে বা অমনি-কিছু বলে থাকবে বাড়ির কেউ। মেয়ের মনে সেই অভিমান ঘুরছে। আমায় বলছে 'তুমি' বলে ডাকতে। লাবণ্য এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে—স্বর্গ আজ আমার হাতের মুঠোয়।

বেশ, 'তুমি' বললেই যদি ওইসব বাজে কথা বন্ধ হয়, তবে তাই। তুমি, তুমি, তুমি। তুমি লাবণ্য—তোমার মতন দুনিয়ায় কেউ নেই। রোজই আসবে তুমি। একবার নয়, একশ'বার এস, হাজারবার এস।

ভারি মজা চলল এর পরে দিনকতক। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে আসে। বাড়িতে অর্ধেক-পঙ্গু মা, দয়ালহরি তো বেশি সময় বাইরে বাইরে, আর আছে ছোট ভাইবোন কয়েকটি। কতগুলো সঠিক জানি নে। কলকাতার মেয়ের পক্ষে ওদের ধোঁকা দিয়ে চলে আসা কিছু নয়। কিন্তু কেমন করে টের পায়, ঠিক এই সময়টা একলা চুপচাপ আছি আমি?

শরীর খারাপের অজুহাত আর বেশিদিন চালানো যাচ্ছে না। কাজকর্ম জমে পাহাড়প্রমাণ হচ্ছে। এ জায়গার মানুষগুলো সর্বংসহা, তাই রক্ষা। কিন্তু সহিষ্ণুতার শেষ আছে। কোন একদিন সদরে চিঠি চলে যেতে পারে। অথবা কলকাতার কোনও খবরের কাগজে।

সন্ধ্যাটাই ভাল। হরিশকে সকাল-সকাল সরিয়ে দিই ঃ অসুখ একেবারে সেরে গিয়েছে হরিশ, আর তোকে অত খাটতে হবে না। দুখানা রুটি সেঁকে রেখে বাড়ি চলে যাস। দুধ আছে,

দুধ-চিনি আর রুটি দিয়ে খাসা পথ্য হবে আমার। সোমত্ত বউ অত রাত্রি একলা ঘরে থাকবে, সেটা ভাল নয়। ঘোর না হতেই বাড়ি চলে যাবি। আমার কী, পড়াশুনো আছে, গানবাজনা আছে —একলা আমি থাকব ভাল।

কিন্তু হরিশের পাকামি আছে। আদর্শ প্রভুভক্তি—শুধু দুধ-রুটি তার মনঃপূত নয়। দু-একখানা তরকারি রান্না করে সামনে বসে খাওয়ানোর জন্য গড়িমসি করে। শেষটা একদিন আচ্ছা করে কড়কে দিইঃ এমন নাছোড়বান্দা কেন রে? বলেছি, তরকারি লাগবে না রুটির সঙ্গে—এক রাশ খাইয়ে বদহজম ঘটিয়ে আবার বুঝি রোগ ডেকে আনবি?

বকুনির ভয়ে হরিশ সেই থেকে বেলাবেলি সরে পড়ে। আমার সঙ্গীত-সাধনা শুরু হয়ে যায়। একদিন এমন হল, হরিশকে সরিয়ে দিয়ে হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল ছুঁইয়ে সবে একবার সা-রে-গা-মা তুলেছি—

রীডের উপরের আঙুল তুলে কলকণ্ঠে বলে উঠি, দেখেছি গো, দেখতে পেয়েছি। আবার কোন্ লুকোচুরি খেলা? আমার চোখে লুকিয়ে থাকবে, এত ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এস— খাটের উপর ভাল হয়ে বসে গান শুনতে হবে।

দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল—আরে সর্বনাশ, আলাদা একজন। লাবণ্য তো নয়, ঝিকমিকে লাবণ্য ফুড়ুত করে কোন্ দিকে পালিয়েছে। কুৎসিত চেহারা, একটা চোখের সাদা ঢেলা বেরিয়ে এসেছে। ভূতের বাড়ি বলে গোলবাড়ির বদনাম—কোন্ অন্ধিসন্ধি থেকে প্রেতিনী বেরিয়ে এল এতদিনে। চেঁচামেচি করে আমার তো একখানা কাণ্ড ঘটাবার কথা—এ জায়গার হাকিম বলেই কোনক্রমে সামলে নিলাম।

কে আপনি?

হকচকিয়ে যায় সে। মুখে জবাব আসে না।

আপনি কে? কী নাম আপনার?

লাবণ্য—

কণ্ঠস্বর কাঁপছে। জোচ্চুরি বলেই এমনি। মতলব করে লুকিয়ে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। ওই যে বললাম 'দেখতে পেয়েছি'—অমনি ভেবেছে, ওকেই দেখেছি আমি। বোকা বনে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ে গেল।

ধমক দিয়ে বলি, লাবণ্য! লাবণ্যকে চিনি নে যেন আমি! ধাপ্পা দেওয়ার জায়গা পেলেন না? এক চোখ পিটপিট করে উনি লাবণ্য হতে এসেছেন।

সেই একটা চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কানা মেয়েটার চোখ নিয়ে খোঁটা দিলাম, এক বিন্দু লজ্জা হল না আমার। একটুকু মায়া নেই। পাংশুমুখে সে বলে, আর চেঁচাবেন না। রক্ষে করুন। গান হচ্ছিল, তাই একটু দাঁড়িয়েছিলাম। অন্যায় হয়েছে। চলে যাচ্ছি আমি।—যাচ্ছি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল। মাটি করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছি: চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন। পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি। জানতে চাই সমস্ত কথা। কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

ফরফর করে চলে গেল জবাব না দিয়ে। ঝুপসি-ঝুপসি গাছ-পালার আড়ালে অদৃশ্য হল। রাত্রিবেলা যুবতী মেয়ের পিছনে ছুটব, এটা হতে পারে না। বিশেষ করে হাকিম যখন আমি। যা ভাবছি, যদি সত্যি চর হয়েই এসে থাকে, আরও আমার অখ্যাতি রটবে। কাজ নেই গণ্ডগোলে।

আমার লাবণ্য এল আর-একটু পরে। গুম হয়ে ভাবছি তখন। নিঃশব্দ পায়ে এসেছে। ডাকে নি, কিছু না। হাসছে মৃদু মৃদু। ঘাড় তুলে হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলাম।

এক কাণ্ড হয়েছে, জান লাবণ্য? কে-এক মেয়ে এসেছিল স্পাই হয়ে। আমাদের কথা গাঁয়ে বোধ হয় কানাঘুষো হচ্ছে। চুপি-চুপি এসে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ধরে ফেললাম।

লাবণ্য চোখ বড় বড় করে বলে, তাই নাকি ?

আবার নাম বলে কিনা লাবণ্য।

লাবণ্য বলে, হতেও পারে।

কী হতে পারে ? কানা-চোখ ঝাঁঝরা-মুখ হতকুচ্ছিৎ সে হবে লাবণ্য !

আশ্চর্য হয়ে তার মুখে তাকাই। দু-চোখে চাপা হাসি তার। একবর্ণ আমার কথা বিশ্বাস করে নি। তা হলে বিচলিত হত। বললাম, সত্যি বলছি। মনে হয়, এই গাঁয়ের কেউ। এসেছিল আমরা কী কথাবার্তা বলি শুনে যাবার জন্য।

লাবণ্য ফিক করে হেসে বলে, তা কেন ? তোমায় দেখে ঢুকে পড়ল কথাবার্তা বলবার জন্য। তোমায় তার ভাল লেগেছে। নিশ্চয় বলছি তাই।

কাছ ঘেঁষে এসে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁ গো, কী সব কথাবার্তা হল ? মিষ্টি মিষ্টি ভালবাসার কথা ?

কী বলছ তুমি লাবণ্য, ছিঃ! ভালবাসা যেন হাটের মাল! যেখানে-সেখানে বললেই হল !

পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কথা উপভোগ করছে। কী রকম ক্ষুধিতের মতন তাকিয়ে আছে, আরও বুঝি বেশি করে শুনতে চায়। বললাম, ভালবাসার কথা তোমারই জন্য শুধু। দুনিয়ার অন্য কোন মেয়ের শোনবার নয়।

অনিন্দ্য মুখখানি আমার দিকে তুলে ধরে সে বলল, কেন, আমি কী ?

এক ফালি জ্যোৎস্না এসে দাঁড়িয়েছ তুমি আমার লাবণ্য। আর কালো-কটকটে সেই মেয়ে—যেন কাদার ঢিবি।

এমন খোশামুদি কথার উপরেও লাবণ্য ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। হাসি কিন্তু মুখে—হাসি ভিন্ন মুখে বুঝি অন্য ছায়া পড়ে না।

এ কী, হিংসে হল তোমার ? ভারি মজা তো!

লাবণ্য বলে, বড্ড হিংসে আমার। আর ভয়। ওই যা বললে তুমি—কাদা হলে ছানতে পার, গড়তে পার, গায়ে লেপটে নিতে পার। জ্যোৎস্নার তো কেবল ভেসে ভেসে বেড়ানো—ধরা-ছোঁওয়া যায় না, আপন করে আটকানো যায় না, শুধুই কেবল পদ্য লেখা। দেখ, তুমি ভুল দেখ নি—সত্যি আমি এসেছিলাম, ওই মেয়েটা ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালাম। কী তুমি বলবে, আড়ি পেতে শুনছিলাম ভয়ে ভয়ে। নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম।

আর মোটে দাঁড়ায় না। হাসুক আর যা-ই করুক, ভয় পেয়ে গেছে মনে মনে। ভয়েরই কথা। এত আসা-যাওয়া দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায়—লোকের নজরে পড়েছে; হাতেনাতে ধরবার জন্য মেয়েটা এসেছিল। পাড়ারই মেয়ে খুব সম্ভব, লাবণ্যের জানা-শোনার মধ্যে। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি—খবর চাউর করে দেবে আক্রোশবশে। কলঙ্ক মুখে মুখে আগুনের মত ছড়াবে। কী গঞ্জনা পাড়াগাঁয়ের সমাজে! আমারই ভুল কবিতা লিখে আর আজেবাজে গল্প করে এতদিন চলতে দেওয়া। আর নয়।

পরদিন দয়ালহরিকে বাসায় ডেকে—যা থাকে কপালে—কথাটা পেড়ে ফেললাম: আপনার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিলাম। আমি অযোগ্য হয়তো। যদি অনুগ্রহ করে···মানে দাদাই অভিভাবক আমার, কলকাতার ঠিকানা আপনার জানা আছে। আমার মত আছে জানলে তাঁদের দিক দিয়ে খুব সম্ভব আপত্তি হবে না। কিছুদিন থেকে ভাবছি কথাটা। যদি আপনি প্রস্তাবে রাজি থাকেন—

দয়ালহরি বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। কিছু যেন বুঝতে পারছেন না। তারপরে হাউহাউ করে এক গাদা কথা বলে চলেছেন। কান্না না আনন্দ বুঝতে পারি নে।

আপনি—তুমি বাবা, পায়ে ঠাঁই দেবে লাবণ্যকে? আঁতুড়ঘর

থেকেই ঠেলাগুঁতো খেয়ে মানুষ, জনমদুখিনীর এতবড় ভাগ্য। একা ওর ভাগ্য নয়, আমাদের বংশ ধরে সকলের।

কেল্লা ফতে, আবার কী! লাবণ্য দেবী, এইবারে তুমি একেবারে আমার। এই গোলঘরের ভিতরেই বাসর আমাদের। গান শোনাব পাশে বসিয়ে ভোর-রাত্রি অবধি। কাদা আর জ্যোৎস্নার একটা তুলনা হল না—তা কাদারই মতন যদি হাতে ছানি আর গায়ের উপর লেপটে রাখি, কে কী বলতে পারবে তখন ?

সন্ধ্যার মুখে অফিস থেকে ফিরে আমাদের কথাবার্তা। হরিশ চা করে দিল, চা ইত্যাদি খেয়ে মাঠের আল ধরে দয়ালহরি দ্রুতপায়ে বাড়ি চললেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আমি। অনতিপরেই আবার দেখতে পাই, বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। চঞ্চল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, চুপচাপ বসে হুঁকো টানবার অবস্থা নেই। বাড়ির মধ্যে খবরটা দিয়ে গ্রাম টহল দিতে বেরুলেন। ওঁর স্বভাব টের পেয়েছি এতদিনে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিরাটগড়ের আপামর-সাধারণ সমস্ত ব্যাপার জেনে যাবে। কত সোমত্ত মেয়ের মা-বাপের হিংসায় ঘুম হবে না। যে মেয়েটা ওত পেতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তারও। আমিও চাচ্ছি ঠিক তাই। লাবণ্য ও আমাকে নিয়ে কথাবার্তা যদি কিছু উঠে থাকে, এবার সকলে খোলাখুলি জানুক, লাবণ্য আসে আমারই কাছে এবং এর পরে কায়েমি হয়ে থেকে যাবে। শুধু পাঁজিতে ভাল একটা শুভদিনের অপেক্ষা।

না, ঠিক উল্টো। এলেন দয়ালহরি আমারই কাছে। এই চলে গেলেন, একটু পরে আবার ফিরে এসেছেন। বললেন, খবরদার, খবরদার। কথাটা পাঁচ কান না হয়ে যায় বাবাজি। সেইটে সমঝে দিতে এলাম। আশীর্বাদ হয়ে যাক, তারপরে। পরম ছ্যাঁচড়া জায়গা—কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। ভাংচি দেবে, ঘোঁট পাকাবে। আশীর্বাদ হয়ে গেলে তার পরে

এই কন্যা। পৌষ মাস পড়বার আগেই আশীর্বাদ সারতে হবে। পাঁজি দেখলাম, আঠারোই মোটামুটি দিন আছে। ওই দিন।

দাদাকে তো জানিয়ে দিতে হবে।

আমি লিখব না, তুমি লেখ। আগ বাড়িয়ে আমার লেখাটা ভাল হবে না। ভাববেন, আমিই তোমায় ভজিয়েছি। ওই আঠারোই'র আগে আসতে লেখ। বরের আশীর্বাদ, কনের আশীর্বাদ একদিনে। দোসরা মাঘ বিয়ে। বলছিলাম তাই বড়-বউকে। পোড়াকপালি শতেকখোয়ারি বলে মেয়েকে গালি দাও, কপালখানা কী করে এসেছে দেখ এইবার। আকাশের চাঁদ নেমে এসে গরিবের উঠোনে বর হয়ে দাঁড়াবে।

দয়ালহরি চলে গেলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। বাপের মতন দাদা, বড্ড রাশভারি। সেজন্য সোজাসুজি তাঁকে না জানিয়ে বউদিকে লিখলাম। উল্লাসে আজকে আর থই পাচ্ছি নে, সে মনোভাব চিঠির লেখাতেও ঝকমক করছে: বউদি ভাই, তোমার চাঁপাতলার পাখনা-কাটা পরী বিরাটগড়ে এসে লুকিয়ে আছে। চাঁপাতলার ঠিকানাটা দাও নি, তা হলে মিলিয়ে নিতাম। তবু নিশ্চয় সেই, সন্দেহ করা চলে না। এমন রূপ আর এমনি স্বভাবের মেয়ে খুঁজে বের করতে পারে, সে চোখ আমার বউদিরই শুধু আছে। মেয়ের ঘরবাড়ি এখানে—কলকাতায় মামার বাড়ি থাকত, তুমি সেই সময় দেখে এসেছ। তোমার ইচ্ছা শিরোধার্য করলাম বউদি, মেয়ের বাপের কাছে এক রকম রাজি হয়ে এসেছি। অঘ্রানে মলমাস, বিয়ে মাঘের আগে নয়। তবু এঁরা আশীর্বাদটা সেরে রাখতে চান। মেয়ের বাপ নয়তো ভরসা রাখতে পারেন না। আবার মুশকিল, ষষ্ঠীপুকুর বলে এক লক্ষ্মীছাড়া জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসে মজুত আছে, সাতশ'টি টাকায় আটকে রয়েছে। কন্যাপক্ষ অতদূর উঠবেন না, বরপক্ষও নামবেন না। হঠাৎ যদি কোন পক্ষের সুমতি হয়ে যায়, তোমার বউদি, তখন তো কপাল চাপড়ানো। সেই হেতু সত্বর হওয়ার দরকার। মেয়ের বাপ

আঠারোই পাকা দেখতে চান। বিয়ে দোসরা মাঘ। তার আগে দাদার এসে মেয়ে দেখে কথাবার্তা বলার দরকার। আমার চোখে ভুল হতে পারে—দাদা না এলে কিছুই পাকা হচ্ছে না।

বউদির জবাব এল : তোমার দেখায় ভুল হবে কেন ভাই? তুমি রাজি তো আমরা সকলে রাজি। টুনুকে বললাম, সে তো রাজি হয়ে মাথা কোমর অবধি কাত করে আনল। নতুন কাকিমার জন্য লাফাচ্ছে। তোমার দাদার এখন যাওয়া মুশকিল, ওঁর মনিবের ইনকামট্যাক্সের মামলা চলছে। জান তো, মনিব কী রকম নির্ভর করে ওঁর উপর—দুটো-একটা দিনের জন্যও ছাড়তে পারবে না। দরকারও নেই, উনি বলছেন। বিয়ের যখন দেরি আছে, তার আগে সুযোগমত গিয়ে কনে আশীর্বাদ করে আসবেন।

আবার লিখেছেন, চাঁপাতলার যে মেয়ের কথা তোমায় লিখেছিলাম, তার বিয়ে হয়ে গেছে। চাঁপাতলা কি একটুখানি জায়গা, মেয়ে কি একটা সেখানে? মেয়েটার চুল দেখলাম কটা মতন—আমারও তাই শেষটা তেমন ইচ্ছা ছিল না…

•

মন্ত্রগুপ্তি বটে! উভয় শক্তিই ধরেন দয়ালহরি—কথা ছড়াতে যেমন ওস্তাদ, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাকতেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে এত বড় ব্যাপার, এত সমস্ত তোড়জোড়, অথচ কাকপক্ষীতে জানতে পারে নি। আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন সতেরো তারিখে দয়ালহরি মুখ খুললেন। যত্রতত্র নয়—সন্ধ্যাবেলা থানায় আমাদের আড্ডা বসেছে, সেইখানে গিয়ে বললেন। কন্যার পিতা হিসাবে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন ওঁদের। আমার নিবেদন, শুভ পাকাদেখা আগামী কাল, আপনারা উপস্থিত-অনুপস্থিত সবান্ধবে আমার বাড়িতে পদধূলি দেবেন, পান-তামাক খাবেন। একত্র হয়ে সকলে পাত্র আশীর্বাদ করতে যাব।

সকলে হৈ-হৈ করে ওঠেন : পাত্র কে হোড় মশায় ? সমস্ত ঠিকঠাক করে ফেলেছেন, আমরা কই ঘুণাক্ষরে জানি নে !

দয়ালহরি একগাল হেসে আমায় দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধতা, এ-ওর মুখে তাকায়। বড়-দারোগা বললেন, ডুবে ডুবে জল খান মশায়। পাত্র হলেন শেষটা আপনি ?

দয়ালহরি বললেন, আমি কিছু জানি নে। হুজুর নিজে উপযাচক হয়ে—আরে দূর, হুজুর বলি কেন, অভ্যাসবশে এসে যায়—বাবাজি নিজে থেকে প্রস্তাব করলেন। ভাল ঘরের ছেলে, ভাল সহবৎ—কত রকম বিনয় করে বললেন। আমি তবু বললাম, বড় ভাই মাথার উপরে, তাঁকে সমস্ত জানানো তো উচিত। তা ভাইয়েরও মত এসে গেছে। তিনি মহাশয় লোক—আসতে পারছেন না, কিন্তু খুশি হয়ে মত দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, কনে চোখে দেখেছেন ভায়া ?

হেসে ঘাড় নাড়ি : দেখেছি বই কি ! কাছাকাছি তো বাড়ি।

দয়ালহরি বলেন, ওঁর বারান্দা থেকে আমাদের উঠোন দেখা যায়। সর্বদাই দেখছেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভাল হোক আপনার। সুখী হোন।

তারপরে একটা সমস্যা উঠল, আশীর্বাদ কোন্ জায়গায় হতে পারে ? বরের বাড়ি কন্যাপক্ষ আসেন, এই হল রীতি। কিন্তু আর যেখানে হোক, গোলবাড়িতে শুভকাজ কদাপি নয়। ডাক্তারবাবু শিউরে ওঠেন। দয়ালহরি অতশত আগে ভাবেন নি, তাঁরও এখন ঘোরতর আপত্তি। অলক্ষুণে বাড়ি—বিয়ে হতে হতে হল না, কনে মরে পড়ে রইল। একলা কনে নয়, তার মা-বাপ যত আত্মীয়-স্বজন। মরে পচে গন্ধ হয়ে গেল। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রইল ঘরের মেঝেয়। আর ও-বাড়িতে শঙ্খ বাজবে না, উলু দেবে না কেউ কোনদিন।

দয়ালহরি বলেন, ধানদুর্বো মাথায় দিতে হাত কেঁপে যাবে

আমার, আশীর্বাদ উচ্চারণ করতে গলা শুকোবে। সে কী কাণ্ড— এখনও সব চোখের উপর ভাসে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ভাবতে গেলে।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, বয়সে আমি অনেক বড়, জাতেও কায়েত। কলমির ঝাড়ের মতন আমরা কায়েতজাত— টেনে দেখুন, একটা-না-একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে। কন্যাদায় উদ্ধার করছেন, মহৎ প্রাণ আপনার, ঠাকুর মঙ্গল করবেন। আপনার দাদা যখন আসতে পারলেন না, আপাতত আমায় তাঁর জায়গা নিতে দিন। আমি বরকর্তা, আমার বাসায় এসে কন্যাপক্ষ আশীর্বাদ করবেন।

এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। সুতহিবুক যোগ পাঁচটা বত্রিশ থেকে। আশীর্বাদ ওই সময়। ডাক্তারবাবু বললেন, এই তবে পাকা রইল। পাঁচটা নাগাত আপনি চলে যাবেন। চন্দন-টন্দন মেখে, গিলে-করা পাঞ্জাবি ফুল-কোঁচা ধুতি পরে পুরো-পুরি বর সাজতে হবে। খুঁত রাখা চলবে না। মেয়েরা নেই, বেটাছেলেদের করতে হবে সমস্ত। সময় থাকতে আগেভাগে যাবেন। বড়বাবু ছোটবাবু আপনারাও যাবেন কিন্তু বরের সঙ্গে। আমরাই সকলে মিলে রীত-রক্ষা করব।

দয়ালহরি করজোড়ে বলেন, আজ্ঞে না। ওঁরা আমার বড় হিতৈষী, সর্বদা দৃষ্টিসুখ দেন—ওঁরা কনেপক্ষ। আমার বাড়ি থেকে একদল হয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।

ডাক্তারবাবু কৃত্রিম কোপে বলেন, আর আমি কেবল ক্ষতিই করে বেড়াই, হিত কারও কখনও করি নে?

দয়ালহরি হাত কচলে হেঁ-হেঁ করেন।

তবে আমিই বা কনেপক্ষ না হব কেন? বর সেজেগুজে আমার বাইরের ঘরে বসে থাকবে, আমি হোড় মশায়দের সঙ্গে আশীর্বাদ করতে আসব।

বড়-দারোগা হেসে বললেন, তা যদি বলেন বর নিজেই তো

সকলের বড় হিতৈষী। হোড় মশায়ের মুরুব্বি উনি। আশীর্বাদের জন্য ওঁরই বরঞ্চ দলের আগে আসা উচিত।

হাসাহাসি চলল খানিকটা। ছোট-দারোগা বললেন, তবে খুলেই বলি। আপনার উপর খুব খানিকটা রাগ ছিল স্যার। সেই একদিন খেলা নিয়ে হোড় মশায়ের সঙ্গে বকাবকি হল, আপনি তাই নিয়ে অকারণে ফরফর করে চলে গেলেন। খেলা বন্ধ করে দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিন বছর অন্তে খত-হ্যাণ্ডনোট তামাদি হয়, কিন্তু দারোগা আর কেউটেসাপের রাগ ইহজন্মে তামাদি হয় না। কিন্তু তাই হয়ে গেল আজকে। উদার পুরুষ বটে আপনি। গরিবের কন্যাদায়ে লোকে দশ-বিশ টাকার সাহায্য করে, কিন্তু যেচে গিয়ে এভাবে কেউ দায় উদ্ধার করে না। বয়সে আপনি ছোট, নয়তো পায়ের ধুলো নিতাম এই দশজনের মাঝখানে।

লজ্জায় এর পরে স্থানত্যাগ করা ছাড়া উপায় কী? কিন্তু যাই বা কোথায়? সর্বত্র এই কথা, সবাই ধন্য-ধন্য করে। কেউ মুখে বলে স্পষ্ট করে, কারও বা চেয়ে দেখার মধ্যে টের পাওয়া যায়। দলিল রেজেস্ট্রির জন্য যারা দূর-দূরান্তর থেকে আসে, তারাও সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। বিরাটগড়ে এসে লাভ অফুরন্ত হল। লাবণ্য, তোমায় পেলাম আর এই অঞ্চল-ভরা এত সুখ্যাতি।

আশীর্বাদ যথারীতি হয়ে গেল। একটা আংটি দিয়েছেন। আকারে ছোট, মাঝের আঙুলে যায় না, কড়ে-আঙুলে অনেক কষ্টে ঢোকানো গেল। দয়ালহরি লজ্জা পেয়ে বলেন, গোপন কিছু নেই—ঘরে ছিল, তাই দিয়েছি। বাবাজির আঙুলের মাপে নতুন গড়িয়ে দেব, তার সময় ছিল না। আর বলতে কী, ট্যাকও ফাঁকা। তবে পুরনো হলেও ভাল জিনিস। ডাক্তারবাবু তো জিনিস চেনেন, আংটির পাথরখানা দেখুন না।

আমার হাত টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। মণিরত্ন চেনেন তিনি সত্যি—এক বয়সে নাকি ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, বই-টই অনেক পড়া আছে। ঠাহর করে দেখে বললেন, তাই তো হে, বৈদূর্যমণি। এ জিনিস কোথায় পেলে বল দিকি? খাঁটি কথা বল।

দয়ালহরি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, পুরনো ঘর আমাদের। কর্তাদের আমলে বিস্তর ছিল। গেছে সব। এক-আধ গুঁড়ো এমনি তলানি পড়ে আছে। তা সকলের মুকাবেলা বলছি—গয়নাও দেব আমি দু-পাঁচখানা। নতুন নয়, তবে সাচ্চা মাল। গা সাজিয়ে দেব।

কথা শুনে ডাক্তারবাবু ভ্রূকুটি করলেন। ফিসফিস করে আমায় বলেন, বনেদিআনা দেখাচ্ছে। নবাব খাঞ্জে-খাঁর নাতি। আমি যেন কিছু জানি নে! গরিবের দায় উদ্ধার করছেন, ভাল কথা। তা বলে ধাপ্পায় ভুলবেন না ভায়া। আংটিটা সত্যি ভাল, দামি জিনিস। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, এমন-কিছু সেকেলে নয়। হয়তো বা চোরাই মাল। তা ছাড়া, পাবে কোথায়? ও-মানুষ সব পারে। বাজে ভাঁওতা আমি সহ্য করতে পারি নে।

মনটা খারাপ হল। দয়ালহরির বিপক্ষে আগেও শুনেছি। কিন্তু আজ থেকে সম্পর্ক আলাদা। লাবণ্যর বাবা—আমার অতি আপন জন। ডাক্তারবাবু এমন করে না বললেও পারতেন আজকের দিনটায়।

কাজকর্ম চুকিয়ে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা। শীতটা বড় কম আজকে। ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে। বড়-দারোগা বলছিলেন, আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। অ্যাটম-বোমার কাণ্ড। অঘ্রানে বসন্ত-কাল পড়ে গেল। বসন্তরোগেরও ধুন্দুমার লাগবে এইবার। ডাক্তারবাবুর মজা।

বারান্দায় উঠে একটুখানি দাঁড়াই। কী আশ্চর্য জ্যোৎস্না!

দিনমানের মতন চারিদিক দেখা যায়। দিনমানটাই যেন মোলায়েম হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি হয়েছে। অতদূরে হোড়-বাড়ির চালের মটকা অবধি স্পষ্ট দেখছি।

শোন শোন, ও লাবণ্য, আমতলায় কেন? আমের ডালে বোলই ধরে নি এখনও—কিসের লোভে ঘুরছ? কাছে এস—কী হল এতক্ষণ ধরে, খবর শুনবে না? খবরের জন্যে ঘুরঘুর করছ, সে কি আর বুঝি নে? লজ্জা কিসের? এস।

ফটকের গরাদ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, ভিতরে আসে না। কথা যা বলে, তার দ্বুনো হাসি। চোখ-মুখ নাচানো তারও দ্বুনো। বলছে, এক গাঁয়ের এবাড়ি-ওবাড়ি বিয়ে, তার মধ্যে মজা কোথায়? গোলবাড়ি থেকে বর হয়ে তুমি চুপিসারে বেরুবে, সে আমার মোটেই ভাল লাগে না। ঘাটের উপরে অনেক দূর থেকে, ধর, বড় বড় পানসি এসে লাগল—বরের নৌকো, বরযাত্রীদের নৌকো, পুরুত আর প্রবীণেরা আলাদা নৌকোয়, আগে-পিছে বাজনাদারের নৌকো। ঘাটে নেমে তোলপাড়। ঢোল কাঁসি সানাই বাজে। সোঁ-সোঁ করে হাউই ওঠে আকাশে, আকাশে উঠে তারা কাটে। চরকি-বাজি ঘোরে বোঁ-বোঁ করে—আগুনের সুদর্শনচক্র। গাঁয়ের যত মানুষ ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের কনে আমিও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি সকলের নজর এড়িয়ে। ভারি ভাল লাগে। এমনি সমস্ত জাঁকজমকের বিয়ে পছন্দ আমার।

কথা তো নয়, মনের খুশির উপছে-পড়া আবোল-তাবোল। হেসে উঠলাম: বেশ তো, এস না, ভিতরে চলে এস। যুক্তি করি দুজনে, কী রকম হলে ভাল হয়।

উঁহু, এমনি আমার কত নিন্দে! এইমাত্র এক কাণ্ড হয়ে গেল, জান? আমি চুল বাঁধছি। মা এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল। এই মারে তো মারে। হাকিম মানুষ হয়ে কী করে জানল রে তোকে? না জানলে অমন চাঁদের মতন ছেলে আপনি এসে ধরা দেয়? বল্ হতভাগা মেয়ে, সত্যি কথা বল্। গোলবাড়ির

পুকুরে জল আনতে গিয়ে সেই সময় বুঝি যেতিস লুকিয়েচুরিয়ে? ভাবসাব করেছিস?

শুনলে গো, তুমি হলে নাকি চাঁদ! চাঁদ ধরেছি বলে মা আমার চুলের মুঠি ধরে গালি দিচ্ছে, আবার হাসিতে ফেটে পড়ছে: ধন্যি কলিকালের মেয়ে রে বাবা, তোদের খুরে দণ্ডবৎ। পছন্দের বর নিজে ধরে নিয়ে এলি, অন্য কাউকে কিছু করতে হল না। তা বেশ হল, দিব্যি হল, সোনার পালঙ্কে রাজরাজ্যেশ্বরী হয়ে বোসগে মা আমার। মায়ের চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক এসে জমতে লাগল। লজ্জা, লজ্জা। আমি তখন দে ছুট—

দয়ালহরি সংসারের কী বর্ণনা দিয়ে থাকেন, আর লাবণ্যের মুখে আহা-মরি এ কোন্ ছবি! দয়ালহরি হেন মানুষ সব পারেন —ওই যা বললেন ডাক্তারবাবু। পাছে কোন দাবি-দাওয়া করে বসি, ইনিয়ে-বিনিয়ে অত দুর্দশা শোনালেন। খুব সম্ভব তাই। তাই নিশ্চয়। বাড়ির এই হাসকুটে মেয়েটা আর কৌতুকি মা— মায়ের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে মেয়ে পালিয়ে এসেছে। ছুটে এসেছে কিনা—বুক উঠছে নামছে, আর মুখের উপর ভুবনমোহন হাসি।

ক্ষেপে গেলাম যেন। ধরে ফেলব, আর এখন ভয়টা কিসের? ওই খাটের উপর বসে ঠাণ্ডা হয়ে বিয়ের যুক্তি-পরামর্শ আমাদের দুজনের। হাঁক-ডাক করে তারপরে গান শোনাব। মোমের মতন কোমল নিটোল পা দুটি ঝুলিয়ে দিয়ে বসে থাকবে লাবণ্য। কী আর হবে! লোকে বলবে বেহায়া বর, বেহায়া বউ। আমাদের বয়ে গেল।

কিন্তু কথা শোনার মেয়ে কিনা! পালাচ্ছে, আমিও পিছনে ছুটি। ভয়-সঙ্কোচ গিয়ে এক্ষুনি হঠাৎ বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে খানিকটা দূরে গিয়ে। খিলখিল হাসি: ধরুন দিকি, কত ক্ষমতা! সে আর পারতে হয় না। ধরুন, ধরুন—

রূপ আর যৌবন হেসে হেসে ডাকছে। পাগল হয়ে ছুটছি।

ছুটতে ছুটতে কাছে এসে গেছি। ধরি এইবারে। ডান দিকে খানিকটা অমনি সরে চলে যায়। থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। হেসে হেসে ভেঙে পড়ছে—ভারি স্ফূর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে। হাসির দমকে দমকে জ্যোৎস্নার দরিয়ায় যেন ঢেউ দিয়েছে। পাঁকাল মাছের মতন লাবণ্য তার ভিতরে পিছলে পিছলে পালায়।

আচ্ছা, এইবারে। ধর। চু-উ-উ—। ছেলেরা কপাটিখেলার সময় দম ধরে যেমন ছোটে। এই ক'মাসে অনেক শিখেছে দেখি শহুরে মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের খেলাধুলো রপ্ত করেছে, খেলাচ্ছে আমায় নিয়ে। নিঃসীম স্তব্ধতা—তার মধ্যে উড়ছে ভ্রমর গুঞ্জনধ্বনি করে। সোনার ভ্রমর।

পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছি, তখন মালুম হল মাঠে নেমে পড়েছি। ধান কাটা হয়ে গেছে, তার গোড়াগুলো উঁচিয়ে রয়েছে শূলের মতো। মাটি যেন পাথর। লাবণ্য কিন্তু অবহেলায় ছুটছে তার উপর দিয়ে। তার পায়ে লাগে না। ছুটছে, কিংবা উড়ছে। শাড়িতে ঢাকা পা যেন লঘু ছুটি পাখনা—মাটির গায়ে গায়ে পাখনা ছুটি উড়ছে। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। মাঠের মধ্যে উঁচু টিলায় বাবলাবন, পাখির কিচিরমিচির সেখানে। কে হঠাৎ ডেকে ওঠে, মুংলি—। মুংলি গরুর নাম। মুংলি-ই-ই-ই—! এদিকে-সেদিকে গরু চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা এখনও, গোয়ালে যায় নি। পোষা গাইগরু কে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

থেমে যাই, মানুষ আছে তবে তো মাঠে। রাত্রিবেলা সোমত্ত মেয়ের পিছু ছুটেছি, হোক না ভাবী বউ, কেউ দেখতে পেলে তাড়া করে আসবে। চিনে ফেলে তখন ভাববে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে হাকিমের। কী সর্বনাশ! থেমে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে পড়ে কাতর হয়ে বলছি, হার মানছি ও লাবণ্য, ধরা দাও এবারে। ধরা দাও।

লাবণ্যও দেখি থেমেছে। হাসছে মিটিমিটি। পাগলই করবে আমায়, ভাল থাকতে দেবে না। আচমকা ছুট দিয়ে ধরি গিয়ে এইবারে। দু হাত বাড়িয়েছি, টেনে নেব বুকের মধ্যে—

হঠাৎ সে আর্তনাদ করে ওঠে : হাতে কী তোমার ? দেখি, দেখি। আমার সেই আংটি। আমার আংটি কে তোমায় দিল ?

হতবুদ্ধি হয়ে বলি, হোড় মশায় দিয়েছেন আশীর্বাদে।

আমার আঙুল থেকে ওই আংটি টেনে খুলে নিয়েছিল। চামড়ার এক পর্দা উঠে গেল, একটু তবু মায়া নেই। জানোয়ার, জানোয়ার! টাকা ওদের সব। হাতটা সরিয়ে নেব, আমার যে তখন সে ক্ষমতা নেই।

মুখ-চোখ তার কী রকম হয়ে উঠল। আমার ভয় করে। মাথামুণ্ডু নেই, এসব কী বলছে ? পাগল নাকি ? ঠাণ্ডা করবার অভিপ্রায়ে বলি, আমি আর তুমি কি আলাদা ? অমন করে বলে না লক্ষীটি। আমার কষ্ট হয়। আংটি আমার হাতে ছোট হয়েছে, তোমার ঠিক-ঠিক হবে। এস, পরিয়ে দিই।

ডুকরে কেঁদে উঠল এবারে : আমায় পরানো যায় না। সেই যা তুমি বল কবিত্ব করে—আমি শুধু জ্যোৎস্নাই। শুধুই চোখে দেখবার। ধরতে পারবে না। জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারবে না। ঘরে আমার ঠাঁই নেই—দিন-রাত ভেসে ভেসে বেড়ানো, নেশা ধরিয়ে দেওয়া তোমাদের চোখে, আর কান পেতে ভালবাসার কথা শোনা। বুকে আমি কোনদিন জায়গা পাব না।

কী যেন হয়ে গেল পলকের মধ্যে। হাত বাড়িয়েছিলাম, হাতের নাগালে এল না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনার অবস্থা আমার নেই। ধনুকের তীর যেমন সাঁ করে চলে যায়, তেমনি সরে পড়ল কোথায় পলকের মধ্যে।

কোথায়, কোথায়!—কোন্ দিকে গেল ? বাবলাবনে শাড়ি-পরা কে একজন। ওইখানে গিয়ে কাঁদছে। না, কাঁদছে না এখন, একটা গাইগরুর গলায় হাত বুলাচ্ছে। আমি পিছনে, টের পায় নি। পিছন থেকে হাত জড়িয়ে ধরি : কী হয়েছে বল ? কত আর খেলাবে আমায় ? আংটি তোমার বাবাই তো দিলেন, নিয়ে নাও তুমি সে আংটি। ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ঝটিতি মুখ ফেরাল। কোথা লাবণ্য—সেই জন, চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। ভাবছি, চোখ খারাপ হয়ে গেল নাকি আমার? রূপের অলক্ষ্য রশ্মিতে সারা মাঠ হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেড়াল আমায়। ওই কতটুকু দূর থেকে ছুটে চলে এল—বাবলাতলায় হাত ধরে ফেলতেই ভিন্ন একজন। আলতো রূপ ছোঁয়া পেয়ে যেন ঝুরঝুরিয়ে ঝরে গেল কেয়ার পরাগের মতন। জোনাকি যেন আলোক ঢেকে ফেলে লহমার মধ্যে কিল-বিলে পোকা হয়ে গেল।

হাত ছেড়ে দিলাম, কিংবা ঝাঁকি মেরে সে-ই ছাড়িয়ে দিল। দু হাত কোমরে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কী ভয়ঙ্কর! প্রেতিনী ভেবেছিলাম একদিন, তবু তো এমন সামনাসামনি এ চেহারা দেখি নি। একটা চোখে আগুনের হলকা, আর কানা-চোখের উল্টনো ঢেলাটা বুলেটের মতন তাক করে আছে ওপাশে। কথা বেরুচ্ছে না বুঝি—ঠোঁট কাঁপল কয়েকবার। তারপর বলে, আপনার ঐ কথা আমিই তো জিজ্ঞাসা করব। আর কত খেলাবেন বলুন দিকি?

হতভম্ব হয়ে বলি, আমি কী করেছি?

বাসায় ডেকে পাঠিয়ে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়ালেন। বাবার কাছে যেচে বিয়ের কথা পাড়লেন তারপরে। এখন আবার আশীর্বাদের আংটি ফেরত দিচ্ছেন।

কবে আমি বাসায় ডেকেছি আপনাকে?

এমনি নয়, চিঠি লিখে। রাখাল ছোঁড়ার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ভণ্ড মিথ্যেবাদী—এখন আর কিছুই মনে পড়বে না।

কী সর্বনাশ, আপনাকে দিয়েছিল সে চিঠি?

আমার নামের চিঠি—লাবণ্য নাম লেখা। আমায় ছাড়া কাকে দেবে? মিথ্যে বলে পার পাবেন না। রেখে দিয়েছি সে চিঠি, ফেলি নি। একলা অসুখে পড়ে আছেন, খবর শুনে কী

রকম মনে হল—বাইরে থেকে ক'দিন উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম। ভিতরেও যাই নি। সেই বড় দোষ হল? দোষ কিসের সে কি বুঝি নে—কুচ্ছিত চেহারা, তার উপরে আমরা গরিব।

কণ্ঠস্বরে সকল তিক্ততা ঢেলে দিয়ে উৎকট হাসি হাসল: যা ভেবেছেন, হবে না। আংটি যখন একবার পরে ফেলেছেন আর রেহাই নেই। দশের মুকাবেলা পরেছেন, বড় বড় সব সাক্ষি। আমি ঠেকাতে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন। বাবাকে নয়, মায়ের কাছে কেঁদে গিয়ে পড়লাম: বিয়ে দিও না তোমরা—ওই আরশুলা-হাকিমের সঙ্গে তো কিছুতে নয়। ও-লোকের চেয়ে মুখ্যুস্মুখ্যু চাষাভুষো অনেক ভাল। মা যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল। বাবা শুনে রাগের বশে গুমগুম করে পিঠে কিল। ঠাণ্ডা মাথায় পরে আমিও ভাবলাম, গরিবের মানমর্যাদা কিসের? বাবার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। এ সংসারে চিরকাল থাকা চলবে না; বিদেয় হতে হবে। যেতেই হবে যে জায়গায় হোক। মরবার হলে তো কলকাতায় খাসা গঙ্গা ছিল, এখানকার নোনা-গাঙে ডুবতে যাব কেন? কলকাতায় মামার বাড়ির ছাত ছিল, লাফ দিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত—গাঁয়ে এসে গরুর দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলো-ঝুলি করবার মানে হয় না। মরতে যখন সাহস পাই নি, হোক বিয়ে—দেখাই যাক। আপনি বিদ্বান মানুষ, দেখতে ভাল। খেতে পরতে দেবেন, আর না হয় লাথিঝাঁটা খাওয়াবেন সেই সঙ্গে। সে আমার খুব অভ্যাস আছে। অপমান করে একদিন বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলেন বলেই তো এত বড় লাভ হাতছাড়া করা যায় না।

এক গাদা কথা বলে পিছন ঘুরে গরুর পিঠে থাবড়া দিল। গরু তাড়িয়ে বাড়ির দিকে চলল। পাথর হয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সারারাত্রি ছটফট করেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। ওই কানা মেয়ে যদি লাবণ্য, কাকে নিয়ে মেতে ছিলাম এতদিন? কার পিছনে ছুটাছুটি করেছি? ষড়যন্ত্র একটা। সেই

আশ্চর্য রূপসী দয়ালহরির চেনাজানা কেউ, হয়তো বা দয়ালহরির মেয়ের সখি। চালাকি করে আমায় ফাঁদে ফেলেছে। পাড়াগাঁয়ে এমন ঘটনা নতুন নয়—ফরসা মেয়ে দেখিয়ে সাত পাকের সময়টা কালো মেয়ে কনে-পিঁড়ির উপর বসিয়ে আনে। এদের পদ্ধতি কিছু নতুন, কালটা আধুনিক বলেই। এখনকার পাত্র শুধুমাত্র চোখের দেখা দেখে পুলকিত হয়ে বরাসনে বসে না। কথাবার্তা বলে ভাবসাব জমাতে চায়। লাবণ্য সেজে সেই কাজ করে দিল। তারপরে আমাকে দায়-উদ্ধারক উদারপ্রাণ বানিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অঞ্চলময় চাউর করে ভাল ভাল সাক্ষি রেখে আশীর্বাদ অবধি চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। হিসাবপত্র করে ছকে ফেলে কাজ হাসিল করা—পিছনে বড় মাথা কাজ করেছে। সুন্দরী শয়তানীকে আর একটিবার হাতের কাছে পাওয়া যায় না? ছেড়ে কথা বলব না তখন।

ঘুম নেই। চোখ বুজে শুই আর উঠে উঠে বসি। বিছানা ছেড়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াই কখনও বা নিশি-পাওয়ার মতন। সে অবস্থা বুঝবেন না আপনারা—বুঝতে না হয় যেন কখনও। হঠাৎ যেন কান্নার শব্দ আসে কানে। আসে কোন্ দিক দিয়ে? একবার মনে হল, আমার বুকের ভিতরে কান্না ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমিই ঠিক কেঁদে উঠেছি। এমন কি, চোখে হাত বুলিয়ে দেখি ভিজে-ভিজে কি না। কিংবা কত বছর আগে এক রাত্রে এই বিয়েবাড়িতে যে তুমুল কান্নার রোল উঠেছিল, পোড়োবাড়ির গোপন কোন কক্ষে আটক হয়ে আছে, তার বুঝি একটুখানি কে ছেড়ে দিল। আজ সন্ধ্যায় ধবধবে মেয়েটা পাগলের মত হয়ে গিয়ে হঠাৎ যেমন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—স্পষ্ট নয়, কান পাতলে সেইরকম যেন শুনতে পাচ্ছি। নিস্তব্ধ রাতে কান পেতে অনেক দূরের ঝিল্লিধ্বনি শোনার মত।

এদিক-ওদিক দেখছি। ঘরের ভিতর কিছু নয়, জানলা খুলে দিয়ে বাইরের পানে তাকাই। রাত্রি শেষ। জ্যোৎস্না ডুবে গেছে,

আমতলায় নিবিড় অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কুঁজোর জল মাথায় থাবড়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুম—ঘুম—ঘুম!

সকালবেলা মাঠ পার হয়ে হোড়-বাড়ি ছুটেছি। এত কাছে থাকি, প্রথম দিন থেকেই দয়ালহরির এমন খাতিরের মানুষ, রাঁধা-ব্যঞ্জন পিঠা-পায়স অবিরত বওয়াবয়ি হয়েছে—কিন্তু আমি আজ প্রথম এই বাড়ি। দয়ালহরি আয়োজন করে একদিন বাড়িতে আহ্বান করবেন—মনের সঙ্কল্পটা মাঝে মাঝে ব্যক্ত করেন—অতএব আহ্বানের অপেক্ষাতেই আসতে পারি নি এত কাল। সেই রাজসূয় কাণ্ডই সত্যি সত্যি হতে চলল, পালকি চড়িয়ে জামাই করে বাড়ি নিয়ে আসছেন। সেইটের যদি কোনপ্রকারে মার্জনা হয়। সর্বনাশের মুখে আঁকুপাকু করে মানুষ, যা মাথায় আসে করে বসে। আমার ঠিক সেই গতিক।

বাইরের এদিকটায় জনমানব নেই। ঘুম থেকে ওঠে নি কেউ, না কী ব্যাপার? সুপারি-পাতার বেড়া দিয়ে ভিতর অংশ আলাদা করা। সেদিকে মুখ বাড়িয়েছি···একটানা আওয়াজ কিসের? ক্ষণে ক্ষণে তীব্র তীক্ষ্ণ ভয়ানক হয়ে ওঠে, আবার কমে যায়, কিন্তু একেবারে থামে না। আওয়াজ ঘরের ভিতর থেকে আসছে।

সহসা পুরুষের গর্জন: সারারাত্তির গেল, সকালবেলাতেও হাপর চালাবি? বাইরে যা এখন, রান্নাঘরে চলে যা বলছি।

তাই বটে, কামারশালে হাপর-চালানোর মতন কতকটা। ভরর-ভরর ভস-ভস, ভস-ভস ভরর-ভরর। বাইরের বাতাস প্রাণপণে কুড়িয়ে দেহে ঢোকাচ্ছে, দেহের ভিতর থেকে বাতাসের শেষ কণিকা অবধি বের করে দিচ্ছে। সমস্ত জীবনসত্তার একটিমাত্র কাজ শুধু এই। নিদারুণ শ্রমে ফুসফুসটা সজোরে হাহাকার করে উঠছে এক-একবার যেন।

এত করে বলছি, কানে যায় না বুঝি? রাতের মধ্যে ছুটো

চোখ এক করতে দিলি নে। এবারে রেহাই দে একটু। তোর দুটো পায়ে পড়ি, চলে যা বেরিয়ে।

আওয়াজের ক্ষণিক বিরতি দিয়ে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠে: তুমি যাও যে চুলোয় খুশি। আমি পারব না। সাত লঙ্কা নড়ে বেড়াবার অত ক্ষমতা নেই আমার।

হায় ভগবান, হায় ভগবান! না নড়বি তো ন্যাকড়া গুঁজে দে মুখের ভিতরে। আওয়াজ না বেরোয়।

তুমি কানের ভিতরে ন্যাকড়া গোঁজ। গুঁজে দিয়ে যম-ঘুম ঘুমোওগে।

পিছিয়ে বাইরের দিকে চলে এসেছি ইতিমধ্যে। এক পক্ষ হলেন দয়ালহরি। বরাবর তাঁর মিনমিনে কণ্ঠ শুনি, নিজের ঘরে সিংহনাদ ছাড়ছেন। বিপরীতে নিশ্চয় বড়বউ—যাঁর হাতের রান্না বিস্তর খেয়েছি এবং লোকের কাছে যাঁর কথা উঠলে দয়ালহরি গদগদ হয়ে ওঠেন। ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ির দাম্পত্যালাপ কান পেতে কেমন করে শুনি? পিছিয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

ফিরে যাব কি না, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবছি। ইতিমধ্যে আরও সব কথাবার্তা হয়ে থাকবে, দূর বলে সম্যক কানে আসে নি। হঠাৎ শুনি, গুম-গুম-গুম আচ্ছা-রকম পিটুনি। আলাপের এতদূর পরিণতি ভাবতে পারি নি। ঘাড় নিচু করে হেঁ-হেঁ করে বেড়ানো মানুষ দয়ালহরি বাড়ির মধ্যে এমনধারা বীরপুরুষ, চাক্ষুষ না দেখলে প্রত্যয় হয় না।

বড়বউয়ের আর্তনাদ: ওরে বাবা, মরে গেলাম—

মরিস নে তো! না মরে চিরটাকাল জ্বালালি এমনভাবে। কত জন্মের শত্রু। বাড়িঘর জমিজিরেত তো অর্ধেক গিয়ে আছে। আমিও যাব। একটা একটা করে সবাইকে খেয়ে তারপরে নিজে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি তুই। মড়া ফেলবার একটা লোক থাকবে না, শিয়াল-কুকুরে টেনে খাবে। তাই তোর কপালে আছে।

কথার ফাঁকে ঢিবঢাব দু-চারটে করে পড়ছে। আর বড়বউ মরি-বাঁচি চেঁচাচ্ছেন: গেছি রে, মেরে ফেলল রে খুনে ডাকাত। আধ-মরা মানুষ বলেও দয়াধর্ম নেই। ওরে, পাড়ার সব মরে গেল নাকি—কেউ একবার থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসে না? হাতকড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাক।

পাড়ার মানুষ কি, বাড়ির বড় মেয়েটাই তো নির্বিকার। লাবণ্য বেরিয়েছে। বাইরে-বাড়ি কোন কাজে আসছিল। আমায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এল।

চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন, ভিতরে আসুন। মাকে মারছেন বাবা। এইবারে বেরুবেন। আচ্ছা, আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনি যাবেন না।

দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে ধীরেসুস্থে ঘরের ভিতর ঢুকল। আজব কাণ্ড। মাকে ঠেঙানোর কথা কেমন সহজভাবে বলে! যেন সকাল-বেলার নিত্যক্রিয়া—মুখ ধোওয়া, উঠানে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, বাইরের উনুনে ফ্যানসা-ভাত চাপানো—এইসবের আগেকার একটা ব্যাপার। গাছ থেকে পাতা পড়ার মত এই ব্যাপারে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। আমার আসার খবর বলেছে গিয়ে লাবণ্য। মুহূর্তে চারিদিক ঠাণ্ডা। জোড়ে বেরিয়ে এলেন—দয়ালহরি, পিছনে বড়বউ।

গাছপেত্নী বলে নাম আছে একটা। চোখে না-ই দেখি, ছেলে-বয়সের রূপকথা এবং পটুয়াদের ছবিতে তার চেহারাটা পেয়েছি। কিন্তু জ্যান্ত মানুষের কাছে কোথায় লাগে কল্পনার বস্তু? নমুনা এই বড়বউ। লম্বা লাঠির মাথায় একটা বড় গ্লোব বসানো—এতেই বর্ণনা হয়ে গেল। বিশাল মাথাটা পাল্লার এক দিকে তুলে দিন, এবং বাকি সমস্ত দেহ অন্য দিকে—ওজনে সমান দাঁড়াবে। দাঁড়ি-পাল্লায় না তুলেই স্বচ্ছন্দে বলা যায়। অবাক হতে হয়, ওই বৃহৎ গোলক কাঠির মত দেহ বয়ে বেড়াচ্ছে কী করে?

বড়বউ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: দেখ, মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান দেখ একবার। পর-অপরের মতন বাবাকে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে

বসিয়েছে। ঘরে যাও বাবা, খাটের উপরে বোস গিয়ে। এতকাল শহরে কাটিয়ে এসেও মেয়ের জ্ঞানবুদ্ধি হল না।

মধুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর—আহা-হা, অন্তর একেবারে শীতল করে দেয়। মা ছোট্ট বয়সে গেছেন, তাঁর কথা জানি নে। আমার বউদিও কিন্তু এমন মিষ্টি সুরে বলতে পারেন না। দয়ালহরি কথায় কথায় বড়বউয়ের গল্প কাঁদেন। শুনে শুনে এক বাৎসল্য-ভরা মা-জননীর ছবি পেতাম। শুধু এই গল্প শুনেই মনে হচ্ছে, অন্তত এই সম্পর্কে তিনি মিথ্যে বলেন নি। মুখে যে কথাগুলো বললেন, আশ্চর্যভাবে আমার মনের ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কথা শুনতে হবে কিন্তু চোখ বুজে। চোখ মেলে দেখতে গেলে বিতৃষ্ণা আসবে। কী উৎকট চেষ্টাই না হচ্ছে কথাগুলো কণ্ঠদেশ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করবার। চোখ বড় হয়ে কোটরের তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, গলার শিরা-উপশিরা দড়ির মতন টান-টান হয়ে ওঠে। কথার চাপে হয়তো বা শ্বাস আটকে শিরা ছিঁড়ে ধপাস করে ভুঁয়ে পড়ে যাবেন। কী জন্যে এত কথা বলতে যান উনি—শুয়ে পড়ে থাকুন না, উঠে আসবারই বা কী দরকার ?

উঠে আসা শুধু নয়, দ্রুত উঠানে নামলেন। রান্নাঘর-মুখো যাচ্ছেন। কত কষ্টের যে যাওয়া! বসে বসে দু-হাতে ভর দিয়ে থপথপিয়ে যাচ্ছেন ব্যাঙের মত। ভাবী জামাই বাড়িতে পেয়ে গেছেন, রান্নাঘরের কায়দা দেখাবেন কিঞ্চিৎ। কত পাঠিয়েছেন এযাবৎ—খাদ্য বললে হবে না, এক-একটি নিপুণ শিল্পকর্ম। খাওয়ার আগে হাতে ধরে দেখতে হয়। দাঁত দিয়ে কামড় দিতে সঙ্কোচ লাগে। আজকেও ঠিক সেই কর্মে রান্নাঘরে চললেন। বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে, বিশুষ্ক এই হাড় ক'খানার উপর কেমন করে দয়ালহরির হাত উঠল। কাল থেকে সম্পর্ক পালটেছে—শ্বশুর-জামাই আমরা। এবং এসেছিও দরবার করতে। কিছুই সে সব মনে রইল না—পদ-প্রতিপত্তির জোরে এতদিন ধমকে এসেছি, সেই ধমকই মুখে এসে গেল।

কী রকম মানুষ আপনি হোড় মশায়—ছি-ছি। অসুখে-বিসুখে এই তো সিকিখানা হয়ে আছেন। মায়াদয়ার কথা ধরি নে, ওসবের ধার ধারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হিসাবি মানুষ তো আপনি—মারতে গিয়ে আপনার হাতেই তো বেশি লাগে।

বড়বউ রান্নাঘরের ছাঁচতলা থেকে ফিরে দাঁড়ালেন। দয়ালহরির জবাবের আগেই বলে উঠলেন, ও কিছু নয় বাবা। কোন্ সংসারে না আছে! দুটো মেটে-কলসি গায়ে গায়ে রাখলে ঘা-গুঁতো লাগে। এ তবু দু-জন মানুষ পঁচিশ বছর ঘরসংসার করছি। কিছু না, কিছু না। একটু জলটল না খেয়ে তুমি কিন্তু যেতে পারবে না বাবা।

দয়ালহরি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠলেন: তোমারই বা আক্কেল কী রকম বাবাজি? হুট করে অন্দরে ঢুকে পড়লে। দু-একবার কাশতে হয়, কিংবা সাড়া নিতে হয়—বাড়ি আছেন নাকি? অবিশ্যি তুমি আপন মানুষ—দেখেছ, দেখেছ। আজ না হল, দু-দিন পরে তো দেখতেই। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি। তবে আমার কথাটাও শোন, দু-পক্ষের বিচার হোক। আগুনের তাতে বসে একগাদা রান্নাবান্না করবে—খোশামোদ করেছি, মাথার দিব্যি দিয়েছি—এত জিনিস রাঁধে, নিজে যদি তার থেকে কণিকা মুখে দেয়! বারোজনকে খাইয়ে দেবে—বললে বিশ্বাস করবে না, বাড়তি হলে পথের মানুষ ডেকে ডেকে খাওয়াবে। ভাল রান্না হয়েছে, ওই যে মুখে একবার বলল—তাতেই কৃতার্থ। আর আমি খেটে-খুটে বাড়ির উঠানে পা দিয়ে দেখব শুকনো কঞ্চি একখানা। কঞ্চি, যাই হোক, বাঁশবনে চুপচাপ পড়ে থাকে—এ কঞ্চি ফ্যাসফ্যাস করে কামারের জাঁতা টেনে মরে দিনরাত। দেখে আর প্রাণে জল থাকে না।

অতিশয় বেজার মুখে হুঁকোদান থেকে হুঁকো টেনে দাওয়ার ধারে গিয়ে ছড়ছড় করে বাসি জল ফেলে দিলেন। খোলের ফুটোর মুখে গাড়ুর নল লাগিয়ে নতুন জল ঢালছেন। কথার জের চলেছে: পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার। দিন নেই, রাত

নেই। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই। কত সয় বল মানুষের? বাড়িতে দাঁড়াতে পারি নে। তোমরা দেখ, আপিস হয়ে গেলেও বুড়ো বাড়ি যায় না—থানায় যাচ্ছে, এখানে-ওখানে ফাঁপোরদালালি করে বেড়াচ্ছে। আসব কোন্ আনন্দে বল, বাড়িতে আমার কিসের টান? যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ ভাল। সারাদিন খেটেখুটে রাত্তিরে দু-দণ্ড সোয়াস্তিতে ঘুমোব, সে উপায় নেই। কতক্ষণ ভাল লাগে? ক'দিন মানুষের ধৈর্য থাকে? এক-আধ দিন নয়, পঁচিশ পঁচিশটা বছর। মাথা খারাপ হয় কিনা, তুমিই বল। সময় সময় সত্যি ইচ্ছে করে মারতে মারতে একেবারে মেরে ফেলে দিই। আমি মরে গেলে ও যে ভিক্ষে করে খাবে, ভগবান সে উপায় রাখে নি।

বলতে বলতে গলা যেন ধরে এল। কলকে নিয়ে গম্ভীর মনোযোগে তামাক সাজতে বসলেন।

বড়বউ ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে তারস্বরে হাঁপাচ্ছেন। হাতের কাজও চলছে, কড়াইয়ে ভাজাভুজির আওয়াজ।

ইতস্তত করে অবশেষে আসল কথা বলে ফেললাম, দেখুন, ষষ্ঠী-পুকুরে একবারটি খবর পাঠালে হয়।

দয়ালহরি ঘাড় তুলে তাকালেন: কেন?

কাতর হয়ে বলি, সাত-শ' টাকার জন্যে সম্বন্ধটা আটকে রয়েছে, সে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দয়ালহরি ভ্রূকুটি করেন: সাত সকালে বাসি হাতে, বাসি মুখে এই তুমি বলতে এসেছ? সেদিন যে খুব ধানাইপানাই করলে—অযোগ্য পাত্র তুমি, অনুগ্রহ করতে বলছিলে। কী হে, মনে পড়ছে না?

মাথা চুলকাই। জবাবের কী আছে!

অনুগ্রহ চেয়েছিলে, তা সেই অনুগ্রহ-ই করলাম আমি। প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছি। যোগ্য-অযোগ্যের বিচার করলাম না। নতুন আবার কী হল?

আগের সে দয়ালহরি নেই। কথাবার্তা চালচলন আলাদা। আমার সেদিনের কথাগুলো তাক করে করে ছুঁড়ছেন। নিরুপায়ে মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আজ নাকি আমার জীবন-মরণ সমস্যা। আমতা-আমতা করে তাই বলতে হয়, ষষ্ঠীপুকুরের ওঁরা আগে এসেছিলেন তো। কথাবার্তাও এগিয়েছিল—

দেমাক করে ভেঙে দিয়ে গেল। এবারে পস্তাবে। সেই তুলনায় কত ভাল পাত্র পেয়ে গেছি, হিসাব করে দেখুকগে। ভাবছি, বরের খুড়ো সেই বাবরি-চুলওয়ালা লোকটাকে বিয়ের নেমন্তন্ন পাঠাব। মনের তুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে বেটা টেকো হয়ে যাবে।

রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসেন। তখন মরিয়া হয়ে বলি, পণের সেই সাত-শ' টাকা আমি দিয়ে দেব। আরও পাঁচ-শ' না হয় এদিক-সেদিক খরচের বাবদ—

দয়ালহরি গম্ভীর হয়ে গেছেন। বললেন, কন্যা দান করতে পারি তোমায়। প্রস্তাব করেছিলে, রাজি হয়ে গেছি। কিন্তু ভিক্ষে নিতে যাব কেন? তোমারই বা সাহস হল কী করে যে ভিক্ষা দিতে চাইছ? এমন আস্পর্ধা ভাল নয়।

লাবণ্য এই সময় লোহার হাতায় আগুন এনে বাপের কলকেয় দিল। তাকাল আমার দিকে। চোখে হাসি উপছে পড়ছে। ভারি যেন মজা!

ধীরেসুস্থে কলকে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে গোটাকয়েক সুখ-টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দয়ালহরি বললেন, বাবাজী, পুরনো ঘর আমাদের। অবস্থা পড়ে গেছে, কিন্তু ভিক্ষের টাকায় মেয়ের বিয়ে দেব না। আমার বাড়ির উপর বসে এতবড় কথা বললে —অন্য কেউ হলে কান ধরে বের করে দিতাম। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, জামাই মানুষ তুমি—ঠিক ঠিক জবাবটাও তো দিতে পারছি নে। যাকগে, বাজে কথায় কাজ নেই। ষষ্ঠীপুকুরের চেয়ে বেশি পছন্দ তোমায়। তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করব। সেই জোগাড়ে লেগে যাও।

রায় দিয়ে তামাক টানতে টানতে উঠে পড়লেন। বোঝা গেল সমস্ত। নাগপাশে জড়িয়ে গেছি। একটা একটা করে দিন কেটে যায়। দয়ালহরি একবার করে উদ্যোগ-আয়োজনের খবর শুনিয়ে যান। আজকে ঢুলির বায়না হল। গাঁয়ের কী হাল হয়েছে—সারা বিরাটগড় ঢুঁড়ে সামিয়ানা মিলল না, সদর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। আর নয়তো ধুতি-শাড়ির আচ্ছাদন দিয়ে কাজ চালানো ছাড়া উপায় নেই। দুর্মুখ গোয়ালা দইয়ের দাম হাঁকছে পঁয়তাল্লিশ টাকা মণ। এই সেদিন অবধি দশ টাকার দই ভোজের পাতে খেয়ে লোকে বাহবা-বাহবা করেছে। সেই জায়গায় পঁচিশ টাকা বললাম তো গোয়ালা কী বলে জান বাবাজি? হবে না কেন পঁচিশ টাকায়? কিন্তু দুধ হবে না—জল। জল জমিয়ে দেব। সে ক্ষমতা রাখে দুর্যোধন। বাবুমশায়, তেমন তেমন ঢাকবার জিনিস পেলে গোটা পুকুর জমিয়ে দই বানাতে পারি।

এমন সব মজার কথায় হাসবার অবস্থা নেই আমার। দয়ালহরি বলেন, ছোটবাবু মাঝে পড়ে শেষটা পঁয়ত্রিশে রফা করে দিলেন। মানুষ কী রকম ত্যাঁদোড় হয়েছে দেখ, দারোগার কথাতেও দর কমাতে চায় না। দারোগা ধমক দিলে আগে মাংনা দিয়ে যেত। তবে আমার হল নমো-নমো করে দায় সারা। মাল নিচ্ছি মোটমাট পনের সের, কত আর ঠকাবি বল্?

মতলব করে এসে শুনিয়ে যান কি না, জানি না। শুনি, আর কাঠ হয়ে যাই। শুভদিন এগিয়ে আসছে। আর বিয়ের পরেই তো আমার ফাঁসিকাঠে চড়বার দিন এগুতে লাগল। ফাঁসির আগে কিন্তু এমনধারা হয় নি। বিয়ের চেয়ে ফাঁসির ধকল অনেক কম।

একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ সেই শয়তানীকে পেয়ে গেলাম। সেই রূপসী। সাহসটা বুঝুন, একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। আগে যেমন আসা-যাওয়া করত।

ক্ষিপ্ত হয়ে বলি, তুমি সর্বনাশ করেছ। কী করেছি আমি, কোন্ শত্রুতা আমার সঙ্গে ?

মেয়েটা তিলেক বিচলিত নয়। আগেকার চপলতা নেই। শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।

কে তুমি ? দয়ালহরির সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার ?

বিষাদে ম্লান দৃষ্টি তুলে সে বলল, কিছু না, কিছু না। দুনিয়ার কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

তুমি জোচ্চুরি করেছ। রূপের ফাঁদে ফেলে কুৎসিত মেয়েটা আমার কাঁধে গছিয়ে দিচ্ছ।

গালি যেন কানে যায় না। আগ্রহে বরঞ্চ স্তিমিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : রূপ আছে আমার ? দেখতে পাচ্ছ আমার রূপ ? তোমার চোখে ভাল লাগে ?

মাথা খারাপ নাকি মেয়েটার ? কোনও মুগ্ধজন কখনও বন্দনা জানায় নি, আয়নায় নিজের মুখ দেখে নি ? জানেই না রূপ আছে কি না তার ?

একেবারে কাছ ঘেঁষে মুখের পানে মুখ তুলে বলে, সত্যি আমায় দেখতে ভাল ? আমতলায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আমারই জন্যে, লাবণ্য আসবে বলে নয় ?

কী আশ্চর্য ! কটকটে-কালো মৌচাকের মতন ফুটো-ফুটো মুখ, তার জন্য পথ তাকাতে যাব ?

আমিও তাই ভাবতাম। তোমার মুখের ভাল ভাল কথা— সমস্ত আমার, একটি কথাও লাবণ্যর নয়। তবু কিন্তু ভয় ঘুচত না। একদিন তার পরখ করলাম। তুমি গান করছ। লাবণ্য এসেছিল, সরে গিয়ে আমি লাবণ্যর পথ করে দিলাম। আড়ি পেতে শুনছি, কী কথা বল তুমি তার সঙ্গে। দেখলাম, তাড়িয়ে দিলে ; কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল। কত শান্তি যে পেলাম তখন !

যে মেয়ে আমায় নিয়ে এমন ব্যাকুল, তার উপরে কতক্ষণ রাগ

থাকে? রাগ আমার জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। বললাম, অনেক লুকোচুরি হয়েছে। আর নয়। আজ আমি তোমার সমস্ত কথা শুনব। নয় তো ছেড়ে দেব না।

কোন্ লোভে মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: ছাড়বে না? কী করবে তবে? ধরবে? ধর না, ধর আমায়—

রাত্রিবেলা সেই আশ্চর্য মেয়ে আমার ঘরের মধ্যে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাকে ধরতে বলছে। পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আমন্ত্রণ। আমি কিছু সিদ্ধতাপস নই। গায়ে কাঁটা দিয়েছে, ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছি। কী অসহ অবস্থা তখন! হাত কিন্তু ফিরে এল—কিছুই নয়, শূন্য, একটা ছায়া। সে ছায়া কাছে থেকে অতি স্পষ্ট দেখছি—দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ মাত্র নয়, ঘনতা আছে। থ্রি-ডাইমেনশন সিনেমা-ছবির মতো। তবু কিন্তু আছে সে দাঁড়িয়ে। বিষণ্ণ কাতর মুখের আকুতি: ধর গো, আমার যে বড় সাধ! কুৎসিত লাবণ্যর গায়ে-গায়ে কতদিন ছায়া হয়ে ঘুরেছি। আমায় জোচ্চোর বললে—সত্যি সত্যি তাই। ওই মেয়ে যা নয়, তাই সাজিয়ে দেখিয়েছি। লোভে পড়ে করেছি—যদি দুটো ভালবাসার কথা বল, যদি একটু ছোঁয়া দাও, একবার যদি আলিঙ্গনে বাঁধ। আমার ছায়ায় লাবণ্যের তুমি ওই রূপ দেখেছিলে। শঠ আমি, শাস্তি দেবে না? দাও গো, দাও। রাগ করে ক্ষেপে উঠে দু-হাতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নাও তোমার বুকের উপর। যেমন লাবণ্যকে নেবে ক'দিন পরে বিয়ের মন্ত্র ক'টা পড়ানো হয়ে যাবার পর।

বলতে বলতে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আমিও তো অধীর হয়ে উঠেছি: চেয়ে দেখ। দেখ। নিতে পারছি কই তোমায়? হাতেই ঠেকছ না। আমি কী করব?

হাতই তুললে না মোটে, ঠেকবে কিসে? মনে ভাবছ, খুব একটা চেষ্টাচরিত্র হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন হয়। বিছানার উপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এদেশ-সেদেশ ছুটোছুটি কর, অথচ একটা পা-ও নড়ে না যেমন।

সে তো স্বপ্ন। এখন জেগে রয়েছি আমি—

জোরে ঘাড় নেড়ে সে বলে, না, স্বপ্ন এখনই। আমরা জেগে —আমি আমার মা-বাপ আর বোনেরা। আরও কত। তুমি বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছ—আর জেনে বসে আছ, এটা করছি, সেটা করছি। ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে—তাকে বল মৃত্যু। জেগে তখন হাসবে : কত সব কাণ্ড করেছি এতক্ষণ—স্বপ্নে হাকিম হয়েছিলাম, স্বপ্নে বিয়ে করেছি লাবণ্য নামে বিকটাকার এক কনে…

শুনতে শুনতে আমারও মনে হল তাই। ঘুমুচ্ছি নাকি আমি? চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেখি। কিন্তু ঘুম যদি হয়, চোখে হাত দিয়েই বা কী বুঝব? এ-ও আর-এক স্বপ্ন—চোখে হাত বুলিয়ে এই ঘুম পরখ করা। ঘুম আর জাগরণে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেই সন্দেহের আজ অবধি মীমাংসায় পৌছনো গেল না। আমার এই কাহিনী দুই জীবনের কলহ—ঘুমের আর জাগরণের। বসে বসে জীবন-কথা লিখছি—ঠিক জানি, আমার পিছন দিকে এই দুটো চোখের আড়ালে কোন কিছুই নেই, একেবারে ফাঁকা। যেই চোখ ফেরালাম, চকিতে ওদিকটা বানানো হয়ে গেল—নজরের আড়ালের সামনেটা অনাবশ্যক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোপাট। সিনেমা-স্টুডিয়োর ছবি তোলার মতন কতকটা। ছবিতে দেখেন বিশাল অট্টালিকা, কিন্তু বানিয়েছে যতটুকু মাত্র ক্যামেরায় আসবে। দোতলার সিঁড়ির হয়তো চারটে ধাপ, ঘরের হয়তো দেড়খানা দেয়াল। বাকি আর কিছু নেই। দর্শক ভাবে, গোটা বস্তুটাই রয়েছে। জগৎটাও তাই।

এই আমার মনের গতিক। আপনারা কতজনে পাগল ভাবেন আমায়, হাসাহাসি করেন—মন্তব্য কদাচিৎ কানে এসে যায়। আমিও আপনাদের ভেবে একা-একা খলখল করে হাসি : দেখ দেখ, পাগলা-গারদের লোকগুলো আমাকেই আবার পাগল বলছে।

সেই মেয়েকে বললাম, হল না হয় তাই। আমার হাত না উঠুক ছুঁতে না পারি, কান দুটো খোলা আছে। তোমার পরিচয় বল, শুনতে পাব। নাম কী তোমার?

নাম? নামে কি চিনবে? চম্পা। আর দুই বোন আমার—যূঁই আর জবা। দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা কোর, সে সব জানে।

নামটা চিনি-চিনি করি। বিশেষ করে পাশাপাশি তিনটে ফুলের নাম পেয়ে। ডাক্তারবাবুর কাছেই বোধহয় শুনেছিলাম। জিজ্ঞাসা করি, সাহেব-কর্তার মেয়ে না তুমি?

ঘাড় নেড়ে চম্পা সায় দেয়। বলে, এই গোলবাড়ি আমাদের। এই যেখানটা তুমি রয়েছ।

এর মধ্যে ভিন্ন কথা নিয়ে আসে: জবাটা বড় হিংসুটে। তুমি পায়চারি কর, তখন বলে কী জান? মেঝেয় অত জুতো ঠক-ঠকিয়ে বেড়ায় কেন? অত দেমাক কিসের? ওকেও যেতে হবে। এমনি কত জনের ঘরবাড়ি জায়গাজমি জ্যান্তরা বারম্বার এসে দখল করেছে। জ্যান্ত মানে—যে-রকমটা ভাব নিজেকে তুমি। চিরকাল ধরে সকলে মরে আসছে, তুমিই কি চিরকাল বাঁচবে?

তোমারই তো বিয়ে হচ্ছিল এই বাড়িতে?

চম্পা বলে, তোমার ঠিক মাথার উপর দোতলার ঘর। তার উপরে ছাত। তার পাশে চিলেকোঠা। চুপি চুপি আমি চিলেকোঠার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বরের নৌকো গোলবাড়ির ঘাটে এসে লাগবে—কত বাজিবাজনা, কত মশাল, সেই আলোয় সকলের আগে আমার বর দেখে নেব। সেই জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তা আমার দুই বোন—দুই মুখপুড়ি জবা-যূঁই টের পেয়ে গেছে। তারাও দেখি পিছনে। রাত কত হয়ে গেল, বাড়িসুদ্ধ মানুষ ঘাটের দিকে তাকিয়ে। তারপরে এসে গেল নৌকো। দুটো-একটা নয়, অনেক—অনেক। কিন্তু বর কই? বর আমার এল না। মশাল নিয়ে ঘাটে বর এগুতে গিয়েছিল, সেই মশাল কেড়ে বাইরের বাজনদারদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। এই গোলঘরের লাগোয়া সিংদরজা—তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করেছে তো দমাদম কুড়ুল পড়ে তার উপরে। আমগাছের মগডাল

থেকে ছাতে লাফিয়ে পড়ে আমাদের তিন বোনের বুকে-পিঠে-ঘাড়ে এদিকে চকাচক ছোরা চালাচ্ছে—

বলছে, আর হাসছে দেখি চম্পা। শুনতে শুনতে আমার দম আটকে আসে, আর হাসে সে তখন। বলে, প্রথম তুমি সেই বিরাটগড়ে এলে, মনে পড়ে? রাতদুপুর হয়ে গেছে, গোলবাড়ির ঘাটে এক ডিঙি লাগল। ডিঙি থেকে তুমি নামছ। লণ্ঠন ধরে মাঝি পথ দেখিয়ে চলেছে। দেখছি আমরা এ-বাড়ি থেকে। জবাটা বড্ড পাজী, সে বলে কী জান? সেদিন বর পৌঁছতে পারে নি—দেখ দিদি, ওই দেখ, তোর বর এসে গেল। আসছে এতকাল পরে। কী বথা মেয়ে, কলজেটা ছোরায় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েও তার ঠাট্টা-হাসি বন্ধ করতে পারে নি। তুমি কিন্তু এ-বাড়ি এলে না—অন্য বাসায় গিয়ে উঠলে। কিন্তু জবার কথাই সত্যিই হল—ঘুরে ফিরে আসতে হল সেই। মরা-বাড়িতে জীবন্ত লোকের বাসা।

আমার আজও সন্দেহ গেল না, সেই সময়টা আমি জেগে ছিলাম না স্বপ্ন দেখেছি? কিংবা জাগরণ আর স্বপ্ন মুখোমুখি হয়ে এত সব কথাবার্তা বলে গেল?

পরের দিন দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা করে নিঃসংশয় হই: চম্পা জবা যুঁই—জানতেন এই নামের তিনটে মেয়ে?

নিস্পৃহ ভাবে তিনি বললেন, সাহেবকর্তা বাড়ির মেয়েদের ফুল দিয়ে নাম রাখতেন। এমনিও ফুল ভালবাসতেন খুব। কর্তা গিন্নি দুজনেই। কাশ্মীরে ফুলের দেশে থাকতেন কি না!

নাম কিন্তু ঠিক ঠিক রেখেছিলেন। মেয়েরা ছিল ফুলের মতন।

দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেন: তুমি দেখলে কোথা হে? গল্প শুনেছ—ডাক্তারবাবুর কাছে? ওঁর খুব যাতায়াত ছিল। কিন্তু বেশি রং ফলিয়ে বলেন, এই যা।

তারপরে যে জন্য আজ আমার কাছে এসেছেন : কলকাতায় যাওয়ার ঠিকঠাক করেছ, তা আমায় মুখের কথাটা বললে না কেন বাবাজি ?

কী সর্বনাশ, কতগুলো চোখ দয়ালহরির ? একটা নিশ্চয় পিছন দিকে, চুলের ভিতরে ঢাকা। মনে মনে কিছু ভাবলেও এ লোকের বোধ করি নজরে এসে যায়।

বলছেন, এ তল্লাটের লোকেও বিয়েথাওয়া করে থাকে। বিয়ের সওদা করতে কলকাতা অবধি যেতে হয় না। সদরে সব-কিছু পাওয়া যায়, বুঝলে ?

কনের খোঁজে আমার বউদি সারা কলকাতা চুঁড়ে বেড়ান। বিরাটগড়ের এই উৎপাত চেপে পড়ে সমস্ত বরবাদ করে দিচ্ছে। ঝেড়ে ফেলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ব, এই ঠিক করেছিলাম। পালিয়ে বাঁচতে চাই। দয়ালহরির হা-হুতাশ পঁচিশ বছর ধরে চলছে। কাঁচা বয়স আমার—হয়তো আমায় দুনো-পঁচিশ বেঁচে থাকতে হবে। বড়বউ পঙ্গু হওয়ায় দয়ালহরির তবু একটা সুবিধা, যত কিছু হাঙ্গামা বাড়ির ভিতরেই—বাইরে বেরুলে নির্ঝঞ্ঝাট। থাকেনও তাই বাইরে বাইরে। বড়বউ, তা ছাড়া, কলকাতার নয় বলে নবেলি বুলি নেই মুখে। মার খেয়ে ঝগড়া করে পরক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে উনুনে কড়াই চাপিয়ে দেন। কিন্তু লাবণ্য নামক শহুরে বস্তুটিকে ঘরের ভিতরে আটক রাখা চলবে না, ঋ-ফলার মত পিছনে সেঁটে থাকবে অহরহ। এবং ট্যাঙস-ট্যাঙস কথা শোনাবে। যতই ভাবি, অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। কাজ নেই আমার সরকারি চাকরি করে। চাকরি এবং বিরাটগড় ছেড়ে সরে পড়ি রে বাবা। তা দেখি, সমস্ত জানেন দয়ালহরি। ঘাটের নেপাল মাঝির খবর অবধি জেনে বসে আছেন।

বলেন, পাঁচ টাকায় তুমি নেপাল মাঝির নৌকো ঠিক করেছ। বেটা জোচ্চোর, গরজ বুঝে ডবল ভাড়া হেঁকেছে। শুনে'তো ছোটবাবু আগুন। দু-টাকা তুমি আবার আগাম দিয়েছ। থানায়

নিয়ে গোটাকতক রদ্দা ঝেড়ে দিতে বেটা নাক-কান মলে টাকা ফেরত দিয়ে এল।

পাঁচ টাকা হোক আর দশ টাকাই হোক, আমার টাকা আমি দিয়েছি। ছোট-দারোগা কোন্ আইনে নেপাল মাঝিকে মারধোর করে ?

রাগে রাগে থানায় ছুটলাম। ছোটবাবু হেসে ঠাণ্ডা ভাবে বল্লেন, আইন পাস হয় স্যার দিল্লির পার্লামেন্টে, কলকাতার এসেম্বলিতে। বিরাটগড় দূরের জায়গা, পথেরও অনেক ধকল। সব আইন ঠিকমত এসে পৌঁছতে পারে না। তখন আমাদেরই আইন বানিয়ে নিতে হয়।

বড়বাবু কথাটা লুফে নিয়ে বলেন, এই কাজটা কিন্তু ষোল-আনা আইনসম্মত। হোড় মশায়ের মেয়েকে ফুসলেছেন আপনি, নিজ হাতে চিঠি লিখে তাকে বাসায় এনেছেন। সে দলিল আমাদের হাতে আছে। উড়ে উড়ে মধু খাচ্ছিলেন, বেকায়দায় পড়ে শেষটা বিয়েয় রাজি হতে হল। এখন আবার অন্য মতলব ভাঁজছেন। ভদ্রলোকের জাতকুল নষ্ট করে অত সহজে রেহাই হয় না। ফৌজদারির কারণ ঘটে। সরকারি লোক বলে আপনার দায়িত্ব আরও বেশি। বুঝে দেখুন সমস্ত। আপনি বন্ধুলোক, আবার হোড় মশায়ও বিশেষ অনুগত আমাদের। কারও উপর অন্যায় জুলুম হয়, আমরা চাই নে।

দয়ালহরি ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। তিনি বললেন, শুভকর্ম মাঘ মাসে হবার কথা, কিন্তু বাবাজির মতিগতি বুঝে অত দেরি করা ঠিক হবে না। ঠাকুর মশায় বিধান দিলেন কন্যা অরক্ষণীয়া হলে মলমাস বলে আটকায় না। ক'টা দিন পরে উনত্রিশে অঘ্রাণ একটা মাঝারি গোছের দিন আছে। কী বলেন আপনারা ?

সবাই এরা একজোট। পরিপাটি বন্দোবস্ত। জায়গাটাও এমন বেয়াড়া—চারিদিকে নদীখাল, নৌকো ছাড়া নড়বার জো

নেই। সে নৌকোর পথ মেরে দিয়ে বসে আছে। নেপাল মাঝির দুর্দশার পর কেউ আর আমায় নৌকোয় তুলবে না।

আবার কী আশ্চর্য, বাসার ঢুকবার মুখে দেখি লাবণ্য। হাতে গরুর দড়ি কুণ্ডলী করা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বলে, মুংলিটা কোন্ দিকে গেল, বড্ড জ্বালাতন করছে। শিঙে দড়ি দিয়ে গোয়ালে তুলতে পারলে যে বাঁচি।

হাসছে নাকি মিটিমিটি, কথাটা রূপক ? আবছায়া সন্ধ্যায় ঠিক ধরতে পারি নে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ধারালো দৃষ্টি দিয়ে ছোরার মতন খোঁচাচ্ছে। বলে, আপনি বুঝি পালাচ্ছিলেন ? এতদিনে বাবাকে চিনলেন না ? এ-গাঁয়ে আমার বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় না। ধরুন, ওই গোলবাড়ির ব্যাপার—বিয়ের রাত্রে লঙ্কাকাণ্ড। বাবা বলেন, তিনি টের পেয়েছিলেন আগেভাগে, সমস্ত জানতেন। এই যাঃ, সব আপনাকে বলে ফেললাম। আমি আবার বাবার ঠিক উল্টো, পেটে কোন কথা থাকে না। বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, এইটে জেনে রাখুন। মিছে পাকছাট মারতে যাবেন না। আপনার কষ্ট, এদেরও হয়রানি। তার উপরে আপনার সেই চিঠি বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পাকা দলিল। গোলমাল করলে ফ্যাসাদে পড়বেন।

শুভার্থীর মতন বোঝাবার ভঙ্গিতে বলি, এমন বিয়েয় সুখী হবে তুমি ?

ধক করে মেয়েটার চোখ জ্বলে উঠল যেন : সুখ কি পেয়েছি কখনও ? বিধাতাপুরুষের ভাণ্ডার দুটো—এক দলের জন্য রূপগুণ আর সুখসৌভাগ্য, অন্য দলের অশান্তি আর চোখের জল। সুখ আমি চাই নে, একটু যদি সোয়াস্তি পেতাম। না পেলেও ক্ষতি নেই। যা আছি, তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না। আর কিছু না হোক, জায়গাটা বদল হবে, নতুন নতুন মুখের গালি শোনা যাবে। ভালয় ভালয় কাটলে যে হয় এই ক'টা দিন।

ধীরে ধীরে বিজয়িনীর মত পা ফেলে সে মাঠে নেমে গেল। গরুর খোঁজেই সম্ভবত। আগে অনেক দিন গাঙের পাড়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের মাছধরা দেখতাম। বেউটি-জালে বড় মাছ পড়েছে—যত আস্ফালি করুক, জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। জলে নেমে কানকো ঠেসে ধরবার আগে জেলেরা ধীরেসুস্থে এক ছিলিম তামাক খেয়ে নেয়। লাবণ্যর ওই চলার ভঙ্গির সঙ্গে কেমন তার মিল আছে।

দু দিন কি তিন দিন পরে। এজলাসে কাজ করছি, একটা দলিল এসে পড়ল হাতে। দয়ালহরি রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করেছেন। সোলেনামা। পড়ে স্তম্ভিত হই। পুকুর-বাগান-ভদ্রাসন কিছুই আর দয়ালহরির নেই। পুরানো দেনার দায়ে মহাজন বিক্রি করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও মামলা করে নানান অজুহাতে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। শেষ মামলাতেও হেরে গিয়ে মহাজনের হাতে-পায়ে ধরে এবারে এই আপোস-রফা হচ্ছে : ভদ্রাসন হইতে উচ্ছেদ এক মাস কাল স্থগিত থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমি অথবা আমার ওয়ারিশগণ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিব। এতদর্থে সুস্থশরীরে সরল মনে অত্র সোলেনামা পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম।

বেজার মুখে—চাপা গলায় অবশ্য—দয়ালহরি বলছেন, মেয়ের বিয়ে ক'টা দিন পরে, ব্যাটা বলছে কিনা বিদেয় হয়ে যাও। বোঝ আক্কেল! বিয়ে কি তবে পথের উপর দাঁড়িয়ে হবে?

বললাম, একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন?

হোড়মশায় তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তার মধ্যে শোধ করে দেব। ব্যবস্থা ঘরেই রয়েছে। ক'খানা গয়না-বিক্রির ব্যাপার, কারও কাছে আমার হাত পাততে হবে না। যদি বল, দিয়ে দিই নি কেন এতদিন। ঘরের জিনিস কেউ কি সহজে বের করে? চেষ্টা করে দেখছিলাম, যদি ঘুলিয়ে দেওয়া যায়।

প্রায় ফিসফিস করে বললেন, এখনও হাল ছাড়ি নি একেবারে। বুঝলে না, সময় নিয়ে মাথার উপরের কোপটা কাঁধে নামিয়ে আনা।

দাদা সেই দিন এসে পড়লেন কলকাতা থেকে। বাসায় ফিরে দেখলাম, বারান্দায় বসে আছেন। এসেছেন অনেকক্ষণ—থানা ঘুরে সবিস্তারে খবরাখবর নিয়ে এসেছেন। ওঁদের যে কী পরিপাটি বন্দোবস্ত, আরও ভাল করে মালুম হল। চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়। দয়ালহরি স্বহস্তে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি দাদা ফেলে দিলেন আমাদের সামনে। পড়তে গিয়ে কান গরম হয়ে ওঠে। আমার সম্বন্ধে যা লিখবার লিখুন, মেয়ের চরিত্র নিয়েও লিখেছেন বাপ হয়ে। আমার ফুসলানিতে মাঠ পার হয়ে সে আমার ঘরে যেত। লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারি নে দাদার দিকে। কৈফিয়তের কিছু নেই—কথা তো খানিকটা সত্যিই। সকল দোষে দোষী আমি। চম্পার উপরে দোষ চাপাতে গেলে হাসবে সবাই, পাগল বলবে। এতদিন পরে লেখা এই গল্প পড়ে আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আপনারাই কতজনে কত কী ভাবছেন। সে আমি জানি।

মরিয়া হয়ে বলি, বিয়ে কি হবেই দাদা?

না হবার উপায় রেখেছ? গোলমাল করলে ঘরে তালা বন্ধ করবে। বর, বরকর্তা দুজনকেই। থানা থেকে আচ্ছা রকম শাসানি দিল। কনে-আশীর্বাদ সেরেই চলে যাব ভেবেছিলাম। এখন যে ফাঁদে ফেলেছে, আভ্যুত্তিকের মন্তর পড়া শেষ না করে এক পা নড়তে দেবে না।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠলেন: কী দুর্বুদ্ধি হল—টুনুর মা এত করে মানা করে, যেতে দিও না লক্ষ্মীছাড়া জায়গায়। কিছুই কানে নিলাম না। ভায়ার ভবিষ্যৎ দেখছি আমি। সমস্ত ছারেখারে গেল এই জায়গায় এসে। তোমার রুচি পর্যন্ত এদ্দুর নেমেছে। ভদ্র সমাজে বলার কথা নয়। গা ঘিনঘিন করছে।

কলকাতায় ফিরে সকলের আগে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে তবে সোয়াস্তি।

নিরুপায়। স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া কোন কিছু করণীয় নেই। মনের এক অদ্ভুত নিরুদ্বেগ অবস্থা। বিয়ের দিন এসে যাচ্ছে তো যাক। ফাঁসির দিন যেমন অপ্রতিরোধ্য রূপে আসে। ডাক্তারবাবুই একমাত্র সুহৃদ আমার। এখনও ভিতরের গোল-মালটা তাঁকে বলি নি। পরের কাছে বোকামি জাহির করে লাভ কী? কুরূপ-কুৎসিত জেনেশুনেই যেন বিয়ে করছি—মহাপ্রাণ বলে আরও তাই খাতির বেড়েছে ডাক্তারবাবুর কাছে। অবসর পেলেই তাঁর বাড়ি চলে যাই, ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে সেই আমলের গল্প শুনি। চম্পার কথা অনেক—অনেক করে শুনতে ইচ্ছা করে:

তিন সোমত্ত মেয়ে—চম্পা জবা যুঁই। তোলা নামও একটা করে ছিল—লগ্নপত্রের সময় সেই সব নাম বেরুল। সংস্কৃত মন্ত্রের মত কঠিন উচ্চারণ, কঠিন বানান। মানে নিশ্চয় খুব ভাল। মন্ত্রের মানে ভাল বই কবে মন্দ হয়? কিন্তু ঘরব্যাভারি চলে না। সেই সব সাধু নাম মনে নেই এখন ডাক্তারবাবুর।

বিয়ে চম্পার। পাত্র সদরের সরকারি উকিলের ছেলে। মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুতে লড়াইয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। বিরাট আয়োজন। আর গোলবাড়ির সব ব্যাপারে যেমন, মাখন মিত্তির ষোলআনা কর্তা। লোকটা মানুষ খাটাতে জানে, নিজেও খাটে অসুরের মতন। পানসি নিয়ে আজ সদরে ছুটল, কাল বা কলকাতায়। ভারে ভারে জিনিস-পত্র আসছে। কত রকমের গয়না, কত কাপড়-চোপড়। উদ্যোগ-পর্বেই লোকের তাক লেগে যায়। গায়ে-হলুদে গাঁয়ের যত বউ-ঝি আসবে—খাওয়াদাওয়া তো আছেই—প্রতি এয়োস্ত্রীকে সোনা-বাঁধানো শাঁখা আর শাড়ি দেওয়া হবে। হিসাব করে সেসব

আলাদা গোছানো হল। লোকে বলে, দেদার রয়েছে—দেবে না কেন? এত দিয়েও শেষ করতে পারছে কই?

আর ওই মেয়ে তিনটে—বিশেষ করে বিয়ের কনে চম্পা। বিদেশ-বিভুঁয়ে ছিল বলে এই অঞ্চলের মত নয়—লজ্জাশরম কম। ভাল ঘর-বরে যাচ্ছে, সে আনন্দ উপছে পড়ছে হাসিখুশিতে। তিন বোনে বাড়িময় কী কাণ্ড যে করে বেড়াত!

ডাক্তারবাবু বললেন, সাহেব-গিন্নির বাতের অসুখ এই সময়টা বেড়ে ওঠায় হামেশাই আমায় গোলবাড়ি আসতে হত। কী যে করে মেয়েগুলো, কেমন করে তার বর্ণনা দিই। এ ওকে তাড়া করছে, ছুটোছুটি, ধুপধাপ সিঁড়ি ভাঙছে, তার মধ্যে এক কলি গান গেয়ে উঠল বা হঠাৎ। খিড়কি-পুকুরে গা ধুতে গিয়ে এক প্রহর অবধি জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। সাহেব-গিন্নি ঝি পাঠিয়ে ডাকাডাকি করছেন, তা কেউ কানে নেবে না। বকশিশের ব্যাপার হলে সিকি-দুয়ানি এমন কি পুরো টাকাও ছুঁড়ে দিচ্ছে কথায় কথায়। ফকির-বোষ্টমকে তামার পয়সা দেয় না—বারকোশ-ভরা চাল, চালের উপরে রূপোর টাকা! ম্যাজিক-বাক্সে ছবি দেখাতে এসেছে, দু-পয়সা করে নেয়। যত ছেলেপুলে ভিড় করেছে, তাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চম্পা লোকটার সামনে টাকা ছুঁড়ে দেয়ঃ ছবি সকলকে দেখিয়ে দাও। কেউ বাদ যাবে না। লাগে তো আরও টাকা দেব।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল হঠাৎ! উজ্জ্বল দিনমান মেঘে ঢেকে অন্ধকার হলে যেমনটা হয়। চতুর্দিকে দাঙ্গার খবর। সে যাই হোক, বিরাটগড়ে গোলমাল হবে না—সবাই পাড়া-প্রতিবেশী, এ জায়গায় ঝামেলার মানুষ কোথা? শুভকর্ম চুকে গেলে গাঁ-অঞ্চলে আর নয়, গোলবাড়িতে আগের মত তালা ঝুলিয়ে সবসুদ্ধ কলকাতায় গিয়ে উঠবেন। জবা-যুঁইয়ের বিয়ে সেখানে। মাখন মিত্তির বাড়িও একটা ঠিকঠাক করেছে, কথাবার্তা বলে টাকা দিয়ে বায়না করে এসেছে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের

মারফতে সেই কলকাতার খবর পাওয়া গেল। ভাগ্যিস যাওয়া হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে যেটা সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে জানি, সেখানেই বেশি গোলমাল। দুনিয়ায় পা রেখে চলা দায়। কলকাতায় ভাগ্যিস তাঁরা যান নি—কলকাতায় না গিয়ে বরঞ্চ ভিন্ন দিকে সুন্দরবনের জঙ্গলে যাওয়া ভাল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মানুষের মতন অত হিংস্র নয়।

কিন্তু কী কাণ্ড! কলকাতার হাওয়া এদিকেও যে ধেয়ে আসে। ঘূর্ণিঝড়—চারিদিক ওলটপালট হয়ে মানুষজন কে কোথায় ছিটকে পড়ে। মানুষ আজব জীব। আজকে গলায় গলায় ভাব, দশ মিনিটের অদর্শনে বুকের ভিতরে মোচড় মারে—সকালবেলা উঠে হয়তো দেখব, ছোরা উঁচিয়ে তেড়ে আসছে তারা পরস্পরের দিকে। হাবাগবা মানুষটি—যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়, হঠাৎ দেখতে পাই ফটাফট আওয়াজে হাল-আমলের বেঁটে-বন্দুক ছুঁড়ে সে মানুষের পর মানুষ ঘায়েল করছে। কোথায় পায় বন্দুক, বন্দুক চালাতে শিখলই বা কবে, খোদায় মালুম। মানুষকে বিশ্বাস নেই ভায়া। সাপ-বাঘ-কুমির সবাইকে বিশ্বাস করবেন—মানুষ কিছুতে নয়।

বিরাটগড়ে তখন থানা হয় নি। সদর থানার অধীনে এ জায়গা। অরাজক অবস্থা, কে কার খবর রাখে? খবর পেলেই বা কী! পুলিসেরও পৈতৃক প্রাণের মায়া আছে।

খবর গড়াতে গড়াতে দিন দশেক পরে কলকাতা পৌঁছে গেল। রোমহর্ষক বলে খবরের কাগজে লেখালেখি চলল বেশ কিছুদিন। দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের টনক নড়ল অবশেষে। বন্দুক সহ পুলিসের একটা মাঝারি দল গ্রামের উপর আস্তানা গাড়ল। তখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যারা নাটের গুরু, ধরা দেবার প্রত্যাশায় তারা চুপচাপ এতদিন বসে থাকে না, কোন মুল্লুকে সরে গিয়ে আবার কোন নতুন ফিকিরে আছে। কিন্তু কাজ দেখাতে হবে—ইটেভিটে-শূন্য গোবেচারা গোটাকতক ধরে ধরে চালান দিল। সাহস পেয়ে

পুরানো বাসিন্দাদের দু-চার জন ফিরে আসছে। দয়ালহরি হোড়ও ফিরল। গোলমালের মুখে ঠিক সময়টিতে সরে পড়েছিল। আগে থেকে টের পেয়ে সড়াক করে পাঁকাল মাছের মত পিছলে গেল। লাবণ্যর পিঠে একটা ছেলে হয়ে মারা যায়। তারপর অনেকদিন দয়ালহরির স্ত্রীর আর কিছু হয় নি। সংসারে তিনি আর দয়ালহরি। আর লাবণ্য তো কলকাতায়। তাহলেও অথর্ব পঙ্গু মানুষ—মুশকিল হল বড়বউকে নিয়ে। দয়ালহরি চেষ্টা করেছিল তাঁকে সুদ্ধ নৌকোয় তুলে নেবার। কিন্তু অতখানি ব্যবস্থা করার ফুরসত হল না। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই নীতিতে একলা বেরিয়ে পড়ল তখন। আর কী আশ্চর্য, হোড়ের ঘরবাড়ি গোলবাড়ির এত কাছে, অথচ ওদিকটা কেউ উঁকি দিয়েও দেখে নি। বড়বউকে ক'টা দিন উপোস দিতে হয়েছিল, এইমাত্র। তা ছাড়া আর কিছু হয় না। দয়ালহরি ফিরে এসে ঠিক ঠিক সমস্ত পেয়ে গেল।

তামাক এনে দিল এই সময়টা। ফড়-ফড় করে গোটা দুই টান দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, গাঁয়ের পুরানো বাসিন্দা অনেকেই কিন্তু ফিরল না। আজও ফেরে নি। খুব সম্ভব দুনিয়ার উপরেই নেই। মাখন মিত্তিরের কথা হত সেই সময়। তালেবর লোক, গিয়েছিল দাঙ্গার মাতব্বরদের কাছে—পুলিস তাই অনেক খোঁজা-খুঁজি করল। মিত্তিরকেও শেষ করে দিয়েছে, এই রকম ধরে নেওয়া হল। আমি বললাম, হতে পারে না। কলির প্রহ্লাদ—ওকে কাটতে পারে এমন অস্ত্র আজও তৈরী হয় নি। তাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। আমার বরঞ্চ মনে হয়, গোলবাড়ির হাঙ্গামাটা তারই চক্রান্ত। সাহেবকর্তা প্রাণের দায়ে দু-হাতে টাকা ঢেলেছেন—তাঁরা বেঁচে থাকলে পরে কোনদিন কৈফিয়তের ভাগী হতে হবে, মরে গেলে মিত্তির একেবারে নিরঙ্কুশ। নইলে বুঝে দেখ, ছাতের কাছাকাছি ধিড়িঙ্গে আমগাছ—সেই গাছে চড়বে বলে অতদূর থেকে মই এনেছে নৌকোয় করে। দড়ি নিয়ে

এসেছে, গাছের ডালে বেঁধে ঝুল খেয়ে ছাতের উপর পড়বে। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে প্লান করা। নয়তো গোলবাড়ি ঢুকে পড়া সহজ হত না। ক-মিনিটের মধ্যে তিন-চারটে ঘায়েল হয়েছিল সাহেব-কর্তার বন্দুকে। অদ্ভুত টিপ ছিল তাঁর।

ডাক্তারবাবু চোখ বুজে হুঁকো টানতে লাগলেন। চুপচাপ। ধোঁয়া কুণ্ডলী হয়ে উঠল। শেষ টান টেনে হুঁকো নামিয়ে রেখে আবার বলতে লাগলেন, বিকেলবেলাটা হোড়মশায় আমায় এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, গোলবাড়ির ছাতে মড়া পচছে এখনও। সেই তিন বোন—

সে কী?

ডালের নীচে বলেই শকুন পড়ে নি, শকুনে দেখতে পায় নি। কিন্তু মড়ার একটা ব্যবস্থা করা ত চাই। চলুন।

কেন জানি নে, চিলেকোঠার পাশে কোণের দিকটায় কারও নজর পড়ে নি। বাড়ির মধ্যে গেছেই বা কটা মানুষ! অতগুলো খুনের পর গ্রামের কেউ ভয়ে ও-মুখো হত না। এমন কি, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েও হাঁটত না কেউ পারতপক্ষে। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকালেই বুক ধড়াস-ধড়াস করত। এত বছর হয়ে গেছে ভায়া, এখনও লোকের ষোলআনা ভয় ভাঙে নি।

মেয়ে তিনটে ডাক্তার-কাকা বলে ডাকত আমায়। আনন্দের প্রতিমা। হাসি ছাড়া মুখ দেখি নি। তাদের কথা শুনে থাকতে পারলাম না। ছাতের উপরে মোটা মোটা আমের ডাল ঝুঁকে এসে পড়েছে, সেই ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পড়ে আছে তিন বোন। বারো-চোদ্দ দিন হয়ে গেছে, বিষম দুর্গন্ধ, মাছি ভনভন করছে। নাকে কাপড় দিয়ে কাছে যেতে হল। কী বলব ভায়া, আজও যেন চোখের উপর দেখতে পাই। আকাশমুখো মুখ—তিনজনের আলাদা আলাদা তিন চেহারা। চম্পা হাসছে। চাপ চাপ রক্ত জমে ছড়ানো চুলে জটা বেঁধেছে, বুকের কাপড়ের উপর জমাট

কালো রক্ত—এতবার ছোরা মেরেছে, মুখের হাসি তবু মুছে দিতে পারে নি। আবার জবাটা ছিল ভারি চঞ্চল, হুড়দাড় ছুটে বেড়াত। দু-পাটি উলঙ্গ দাঁত, চোখ বোজা—মনে হল দাঁত বের করে আততায়ীকে ভেংচি কাটছিল মৃত্যুর সময়টা। জবার গা ঘেঁষে যূঁই। বড্ড ভয়কাতুরে, দিনমানেও একলা ঘরে থাকতে পারত না, জবা খুব ক্ষেপাত তাই নিয়ে। আমরাও ঠাট্টা-তামাশা করতাম। আহা, বড্ড কেঁদেছিল মেয়েটা—চোখের পাতা ভিজে আছে বুঝি এখনও, কোঁচার খুঁটে জল মুছে দিতে ইচ্ছে করে। তখন ঘোর হয়ে গেছে। আমি আর দয়ালহরি ছাতের কার্নিসের উপর দিয়ে একটা একটা করে নীচের আমতলায় ফেলে দিলাম তিনজনকে। শব্দ করে পড়ল ভারী আসবাবপত্রের মতন। টানতে টানতে সেখান থেকে গাঙের খোলে। বিয়ে হয়ে বাজনা বাজিয়ে ওই গাঙের উপর দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা, তা গাঙের জলেই ফেলে দিলাম তাদের। মানুষ কোথা পাই তখনকার সময়ে, এর বেশী আর কিছু করার উপায় ছিল না।

এক রোগী এসে পড়ায় ডাক্তারবাবুর গল্পের ছেদ পড়ল। আমিও সইতে পারছিলাম না। রক্ষে পেয়ে গেলাম।

আমার বিয়ে হল। এক রকম জিনিস আছে—দীপক-বাজি। অথবা সরা-বাজি। সকলের অবস্থা সমান নয়, বাজি-বাজনা সব বিয়েয় হয় না। কিন্তু নিতান্ত অপারগ না হলে কয়েকটা দীপকের জোগাড় করবেই। বাজিকর লাগে না, নিজেরা জ্বালিয়ে ধরে শুভদৃষ্টির সময়টা। দিনমান হয়ে যায়। কড়া রোদের দিনমান নয়, অতি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোর মত। আমি দাঁড়িয়েছি জলচৌকির উপর, মাথার উপরে চাদর ঢাকা দিয়েছে। কনে পিঁড়িতে বসিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল সেই চাদরের নীচে। কনের মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিল। পাশ থেকে কে বলছে, চোখ খুলে ভাল করে দেখে নাও এই শুভক্ষণে। তবে

তো সুখশান্তি হবে, দুজনায় ভাব-সাব হবে। শি-ই-স-স করে দীপক জ্বলল দু-পাশে দুটো।

ডাক্তারবাবুর গলা শুনলাম: গা-ভরা গয়নার কথা বলছিলে হোড়মশায়, সে সব কি হয়ে গেল? দু-গাছা শাঁখা পরিয়ে এমন ন্যাড়া কনে কেউ ছাদনাতলায় আনে!

দাদা বললেন, এই ভাল হয়েছে, খুব ভাল। ভাই আমার বিনি-গয়নায় পছন্দ করেছে। গয়নায় বেশী কি জৌলুষ বাড়ত?

আমি কিছু তাকিয়ে দেখি নি। লাবণ্য তাকিয়েছিল, পরে তার কাছে জানলাম। বাসরের মধ্যেই বলল, সে বুঝি ধৈর্য ধরতে পারছিল না। খরদৃষ্টিতে চেয়ে চাপা গলায় কানে কানে বলে, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজেছিলেন, চিরকাল পারবেন অমনি চোখ বুজে থাকতে?

কথা সত্যি। ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু বুজে অন্ধ হব, সমস্ত জীবন ধরে এরকম চলে না। দেখতেই হবে বউয়ের দিকে তাকিয়ে, না দেখে উপায় নেই। লাবণ্য সেটা মনে করিয়ে দিয়ে বেশী ভয় ধরিয়ে দিল। আজকে এই বাসরের রাতটুকু কাটাতে হিমসিম খাচ্ছি, কত রকম বুদ্ধি খেলাচ্ছি। যত গরিবানার বিয়েই হোক, এবাড়ি-ওবাড়ির মেয়ে-বউ কয়েকটা এসেছে। ফলাও করে গল্প জমিয়েছি তাদের সঙ্গে। পুলকে অতিমাত্রায় ডগমগ হয়ে গেছি যেন আমি। গান গাইতে বলছি তাদের, নিজেও গাইছি। একখানা দু-খানা করে অনেকগুলো গেয়ে ফেলেছি—কান্না না এসে গানই আসছে কেবল। মেয়েদের চোখে ঘুমের ঝিমুনি, বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ছাড়ছে কে? বরকেই বাসরের মেয়েরা খোশামোদ করে—আমি উল্টো তাদের বলছি, আর একটু থেকে যান, খুব ভাল একখানা গান গাইব এইবার। গানও টেনে টেনে লম্বা করি। হাতঘড়ি দেখি, আর আগামী দিনের দিনমণির উদ্দেশে মনে মনে বলি, এই একটা দিন সুয্যিঠাকুর আগেভাগে

উদয় হও, মেয়েরা উঠতে উঠতে পুবে ফরসা দিক। আমি বেঁচে যাব, সৃষ্টিও তাতে রসাতলে যাবে না।

এক সময় অবশেষে চলে গেল মেয়েরা। আমি হাই তুলছি। বড্ড ঘুম ধরেছে, এক্ষুণি যেন গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ব। গা সিরসির করছে—ওই বস্তু স্ত্রীর অধিকারে কখন চেপে এসে পড়ে এই একান্ত সান্নিধ্যের মওকায়। আরও মুশকিল, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ—বাসরের প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলবে, নেবানো অলক্ষণ। অন্ধকার অনেক ভাল, চেহারাটা স্পষ্টাস্পষ্টি চোখের উপরে না থাকায় আতঙ্ক কিছু কম থাকে, যৌবনের স্পর্শের অনুভূতি দৃষ্টির বীভৎসতা কিছু মোলায়েম করে আনে। আলো থাকলে সেটা হয় না। আলোকিত বাসরে কোন্ কৌশলে সকাল অবধি কাটাব, ভেবে দিশা পাই নে।

বড় একটা হাই তুলে উল্টো দিকে ফিরে ঘুমের ভান করি। লাবণ্য খলখল করে হেসে ওঠে। পাতা পাতা কবিতা লিখেছি, অতএব কল্পনার দৌড় আপনাদের দশ জনের চেয়ে নিশ্চয় আমার অনেক বেশী। কিন্তু মানুষীর অমন হাসি কল্পনার চোদ্দপুরুষের আন্দাজে আসে না। বলে, মুখ ফিরিয়ে শুলেন, আমার বুঝি মুখ দেখবেন না? আমি যদি এখন ওপাশে চলে যাই? কিংবা জোর করে আপনার মুখ টেনে ফেরাই এদিকে? বসন্ত চোখের ঢেলা গেলে দিয়েছে, কিন্তু হাত নুলো করে নি।

বলে একেবারে গায়ের উপর এল। বাঁ হাতটা ফেলে দিল বুকের উপর। কী ভারী, বিশমণি পাথর একখানা দড়াম করে যেন আছড়ে মারল। দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। স্ত্রীলোক এবং যুবতীও। আমার মনে হল, বোড়া সাপে পাকে পাকে বেড় দিয়েছে আমায়। দম আটকে মারবে।

আর কী উৎকট আওয়াজ এই সময়টা রান্নাঘরের দিকে। গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং, বর্ষারাতে ব্যাং ডাকে যেমন। একবার বা মনে হয়, ধুনুরিরা তুলো ধুনছে—টং টং, ঘ্যস ঘ্যস।

দয়ালহরির গলা পাই ঃ আজকের রাতটা ক্ষমা দাও বড়বউ। জামাই-মেয়ে ও-ঘরে। কাল থেকে আবার লেগো। ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে যখন পথে গিয়ে দাঁড়াব, সেই সময়টা খুব কাজ দেবে। ডবল করে লেগে যেও তখন।

পথে দাঁড়াবার কথা হচ্ছে, তার মানে দেনার টাকা শোধ হবার আশা নেই। এটা আমি সেই দিনই বুঝেছিলাম। পারলেও দেবেন না টাকা। ভাঁওতা দিয়ে একটা মাসের সময় নেওয়া নতুন কোন মতলব খাটাবার জন্য।

ঘর-তক্তাপোশ আমাদের বাসরের জন্য ছেড়ে দিয়ে ওঁরা আজকে রান্নাঘরে শুয়েছেন। শাশুড়ির গলার আওয়াজ সেই একদিন সকালবেলা শুনেছি—নিষুতি রাত্রে এখন আলাদা বস্তু, দিনমানের সঙ্গে একেবারে মেলে না। বোধ করি, ঘুমের আবেশ জুড়ে গিয়ে গলার এ হেন রকমারি সুর বেরুচ্ছে। পুরুষ-সিংহ বলি শ্বশুর মশায়কে, ঘরের মধ্যে এই কাণ্ড নিয়ে পঁচিশ বছরের হাজার হাজার রাত কাটিয়ে আসছেন।

বলছেন, মেয়েটার গতি হল, গলার বড় কাঁটাখানা নেমে গেল। এবারে তুমি কবে নামবে বলতে পার? বুড়ো হয়ে গেছি, আর এখন পেরে উঠছি নে।

শাশুড়ি টেনে টেনে বলেন, তুমি গলা টিপে ধরে শেষ করে দাও। বাঁচাও আমায়। পোড়া যমরাজের দয়াধর্ম নেই। ভালটা-খেকো যম। কানা যম, চোখে দেখে না।

দয়ালহরি টিপ্পনী কাটেন ঃ কালা যম, কানেও তো কিছু শুনতে পায় না।

জনম ধরে শ্বাস টানছি। দম বেরিয়ে যায় না একদিন! গণ্ডারের চামড়ার ফুসফুস দেছে বিধাতা—ফুটোফাটা হয় না রে। দাঙ্গায় কত গাঁ-ঘর উচ্ছন্ন হল, কত লোক মরল—একলা মানুষ আমি বাড়ি আগলে রইলাম, কোন হাড়-হাবাতে এগিয়ে এল না।

দয়ালহরির পুনশ্চ রসিকতা ঃ এসেছিল হয়তো। গলার বাজনা

শুনে ভয় পেয়ে পালাল। কত রকমের সুর বেরোয়, নিজে তা বুঝতে পার না বড়বউ। বাইরের লোকে বোঝে। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। আর ওই জামাই হতভাগা বুঝতে পারছে।

দাম্পত্য রসালাপ। পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার চলছে। জামাই মানুষ আমার পক্ষে শোনা অনুচিত। কিন্তু উত্তাল বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে গানের কথার মত আপনি এসে কানে ঢুকছে। কী করি—চোখ বুজে পড়ে আছি, কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দিই নাকি ?

হঠাৎ দয়ালহরি হাহাকার করে উঠলেন : ভুল হয়েছিল বড়-বউ। বড্ড ভুল করেছি সেই সময়টা পালিয়ে গিয়ে। তুমি বাতিল পঙ্গু মেয়েমানুষ একলা পড়ে আছ—জানে, টাকা-পয়সা মালপত্তর নিয়ে আমি সরে পড়েছি, হেলা করে সেইজন্যে এল না। আমি থাকলে আসত, নির্ঘাত সাবাড় করত। মুক্তি পেয়ে যেতাম—পোড়া দেহ বয়ে বেড়াতে হত না।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যম ডাকছেন, দাঙ্গাবাজদের ডেকে ডেকে মুক্তি চাইছেন। অথচ কত সহজ মরা। বিধাতা পুরুষ বলে সত্যি যদি কেউ থাকেন—যেমন তিনি জ্বালাযন্ত্রণা দিয়েছেন, রেহাই পাবার উপায়ও দিয়েছেন অজস্র। এত সব কায়দা হাতের কাছে থাকতে মানুষ বাঁচার ঝামেলায় যায় কেন ? আলস্য, অথবা গতা-নুগতিকতার মোহ। আর এক হতে পারে, মরার পরের অবস্থা জানা নেই বলেই ভয় পায় কাপুরুষের দল। লাবণ্যর সেদিনের কথাগুলোই ঘুরিয়ে বলা যায়, ভাল কিছু না পেলেও ক্ষতি নেই। বেঁচেবর্তে থেকে যে রকমটা আছি, তার চেয়ে কখনও খারাপ হতে পারে না। আর কিছু না হোক, জায়গা বদল হবে।

লাবণ্য দেখি খুকখুক করে হাসছে। আমার গায়ে খোঁচা দেয় : কী গো, ঘুমুলেন নাকি ? বাহাদুরি ঘুমের ! গর্ভধারিণী-মা হলেও আমি আঁতকে আঁতকে উঠি। বাবাও ঘুমোন না একসঙ্গে এতকাল ঘর করে। নতুন লোক আপনি যেন মরে ঘুমুচ্ছেন।

পরের দিনটা কালরাত্রি। রাত্রিবেলা বর-বউয়ে দেখা হতে নেই। তবু যা হোক নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। মুনি-ঋষিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, ভেবেচিন্তে এই কালরাত্রির বিধান দিয়ে গেছেন। অনেক ধকলের পর একটা রাত্রির সোয়াস্তি। খানিকটা সইয়ে নেওয়া। তারপর থেকে একনাগাড়ে চলল। এক, মরে বাঁচতে পার, যতদিন জীবন থাকে তার মধ্যে রেহাই হবে না।

বাসর থেকে বেরিয়ে ভোরবেলা মাঠ পার হয়ে গোলবাড়ি এলাম। ছুটে পালানোর মতন। মাথায় হাত দিয়ে ঝিম হয়ে আছি। হরিশ এসে দালানে খুটখাট করছে, টের পাচ্ছি সমস্ত। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। বোষ্টম গান ধরেছে বাইরের আমতলায়। সকালে এসে মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে যায়। এই সব গ্রাম্য গান ভাল লাগে আমার। ওদের ডাকিয়ে এনে শুনি, পয়সা দিই।

মান করেছেন বিধুমুখী—

আরক্ত চোখ তুলে চেঁচিয়ে উঠি : চুপ, চুপ কর। নিকুচি করেছে তোমার বিধুমুখীর।

হরিশ ছুটে এল। গান থামিয়ে বুড়ো বোষ্টম দাঁত বের করে হাসছে : আজকে সিকি দিলে হবে না বাবা। পুরো একটা টাকা।

বেরোও—

আপনারা নিদয় হলে বাঁচব কেমনে হুজুর ?

বাঁচতে কে বলেছে ? মর, মরে যাও—

হরিশ দুঃখিত হয়ে বলে, শুভকর্ম বলেই এসেছে। ওরা পেয়ে থাকে। এখন চলে যাও বাবাঠাকুর, হুজুরের মন ঠিক নেই।

পুকুরঘাটের দিক থেকে দাদা উঠে এলেন। জামা-জুতো পরতে পরতে বলেন, আমি চলি। কাজকর্ম যা ছিল হয়ে গেছে, আজকে ওরা আটকাবে না।

ঘাড় নিচু করে থাকি। আমার এই দাদা—বাপের মতন অভিভাবক—কথাবার্তার কোন্ মুখ আছে তাঁর কাছে ? এই ক'দিনে একটা বারও বউদি কিংবা টুনুর কথা উঠল না। বউদিকে

হয়তো জানতেই দেবেন না বিয়ের খবর। একা আমি পড়ে রইলাম। ফুলশয্যা বাকি এখনও। তারপর বিরাটগড় ছাড় আর চাকরিই ছেড়ে দাও, বউ ঘাড়ে নিয়ে বেরুতে হবে। এমন বউ—ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে গেলে জোঁকের মতন এঁটে থাকবে। চম্পার চালাকি, চম্পা আমার এই সর্বনাশটা করল।

সেই দিন রাত্রিবেলা চম্পা এসে হি-হি করে হাসছে: গা সাজিয়ে তোমার বউকে গয়না দেবার কথা। দিয়েছে ?

মিথ্যুক বুড়ো, জুয়োচোর—

আমার রাগটা খুব উপভোগ করে, গালিগুলো মেনে নেয়। প্রসন্নমুখে ঘাড় নাড়ে: বলেছ ঠিক। হোড়মশায় ভারি শয়তান। তা হলেও নিজের মেয়েকে ফাঁকি দেবার মতলব ছিল না। কী করবে, ঝিকমিকে গয়না সব কটকটে কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরেমুক্তো কাচ। হ্যাঁ গো, সত্যি—ম্যাজিকে হয়ে গেল।

হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির দমকে কথা বেরোয় না। বলে, দয়ালহরি ঘরের মেঝেয় গয়নার বাক্স পুঁতে রেখেছিল। যে-ঘরে তোমাদের বিয়ের বাসর, সেখানে—তক্তাপোশের তলায়। দুয়োরে খিল এঁটে বিয়ের আগের দিন রাত্রিবেলা খন্তা দিয়ে মেঝের মাটি খুঁড়ে ফেলল। চন্দনকাঠের বাক্স খুলে উলটেপালটে দেখে, আর কপাল থাবড়ায়। হি-হি-হি। সেই নাচুনিটা যদি দেখতে!

বিমূঢ়ের মতন চেয়ে আছি দেখে চম্পা হাসি থামাল: চোরের উপর বাটপাড়ি গো। দয়ালহরির চেয়ে ঢের বেশি ঘোড়েল মাখন মিত্তির। ওঁকে সে ইচ্ছেমত বেচতে পারে, কিনতেও পারে। গয়না আমার—মিত্তির কলকাতা থেকে বিয়ের গয়না গড়িয়ে আনল। বাবার কাছ থেকে পুরো দাম নিয়ে ঝুটো-জিনিস এনে দিল। জানে, বিয়ে হবে না। দাঙ্গার মাতব্বরদের সঙ্গে আগে-ভাগে বন্দোবস্ত করে এসেছে, সময় মতন তারা এসে পড়বে।

জানে, দু-পাঁচ দিনের ব্যাপার—তার মধ্যে গিল্টির গয়না কালো হবে না। তারপরে হাঙ্গামা যখন ঘটবে, পাথর ঠুকে গয়না যাচাইয়ের লোক পড়ে থাকবে না কেউ। জানে, আমায় মেরে ফেলবে, গয়না যার গায়ে পরবার কথা—

বলতে বলতে কেঁদে উঠল। দশ বছরের পুরনো শোক উথলে ওঠে ছায়াময়ীর কণ্ঠে: মাথায় মারল লোহার বাড়ি, পিঠে মারল ছোরার কোপ। আমি কোনও দোষ করি নি। আশি-নব্বুই হয়ে যায় কতজনের, চুল পাকে দাঁত পড়ে, তবু তারা বেঁচে থাকে। আমি কেন বাঁচতে পারলাম না? পা বাড়িয়ে আমি কেন ছুঁতে পারি নে মাটি? হাত বাড়িয়ে কেন ধরতে পারি নে তোমায়? বিয়ের কনে চুপিচুপি গিয়ে ছাতের আলসে ধরে দাঁড়িয়েছি···

পদ্ম যুঁই নিঃসাড়ে পাশে এসেছে। পদ্ম বলল, বর দেখছিস? ওই দেখ্—ওই বোধ হয় বড় ছই-দেওয়া নৌকোটায়। নৌকোর বহর সাজিয়ে এসেছে বিয়ে করতে।

যুঁই বলল, আলো জ্বালে নি দাঙ্গার ভয়ে। মানুষের দঙ্গল নিয়ে এসেছে। পাটার উপরে কত মানুষ বসে আছে ওই সারি সারি!

পদ্ম বলল, ভয়ে পড়ে আনতে হয়। পুলিস হতে পারে। কিংবা হয়তো লেঠেল। বিশ-ত্রিশ জন এসে পড়েও যাতে কায়দা করতে না পারে।

যুঁইয়ের মনটা বড় নরম। ভিজে-ভিজে গলায় বলল, কত আলো কত বাজি-বাজনা হবে, সেখানে পুলিস মোতায়েন রেখে আঁধারে আঁধারে দিদির বিয়ে—

পদ্ম বলল, হোক গে। এসে পড়েছে তবু ভালয় ভালয়। যা সব কাণ্ড চারদিকে!

নৌকো লাগল ঘাটে। যে ঘাটে প্রথম তুমি এসে নামলে, মাঝি যেখান থেকে লণ্ঠন ধরে গাঁয়ে নিয়ে এল। নৌকোর মাথা পাড়ে ছুঁয়েছে কি না-ছুঁয়েছে, যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ল। পড়েই দৌড়চ্ছে আমাদের বাড়ির দিকে।

যুঁই বলল, দৌড়য় কেন বরযাত্রীরা ?

পদ্ম বলল, বাড়ি ভিতর ঢুকতে পারলে তবে সোয়াস্তি। যা কাণ্ড চারদিকে! মনে হয়, পথেই কোনখানে তাড়া খেয়ে এসেছে।

যুঁই কেঁদে বলল, কবে যে আবার মানুষ ভাল হবে, সকলের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে আসবে!

ওদের আলো নেই দেখে মশাল নিয়ে কনেপক্ষের লোক বেরিয়েছে। এগিয়ে আনবে। মশাল কেড়ে নিয়ে তারা রে-রে-রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ঘড়াং করে সিংদরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে দরজা নেই, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে। তিন বোন থরহরি কাঁপছি আমরা চিলেকোঠার দেয়াল ঘেঁষে—

আর এক মেয়ে সহসা যেন বাতাসে ভেসে এসে চম্পার কাঁধে হাত বেড় দিয়ে দাঁড়াল। বলে, মিথ্যে বলবি নে চম্পা। কাঁপছিলি তুই আর যূঁই। আমার মজা লাগছিল। আলোর দুঃখ করেছিল যুঁই—বাজনাদারদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল, কত আলো হয়ে গেল লহমার মধ্যে। তোর বিয়ের মতন অত আলো কোন বিয়েয় হয় না রে চম্পা।

চম্পা বলে, এমনি সময় ধুপধাপ আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আমের ডাল থেকে মরদেরা ছাতের উপর পড়ছে। ডালে দড়ি বেঁধেছে, সেই দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে খেয়ে পড়ল। পালাব, নীচে যাব, সময় দিল না। মানুষ নই যেন আমরা, ক্যাচ-ক্যাচ করে কচু-কলাগাছের উপর যেন ছোরা মারছে। আলোর বড়াই তো করলি পদ্ম, বাসরের কথাটা বললি নে ? বিয়ের বাসর ওই ছাতের উপরে, রক্তের সমুদ্দুর খেলছে। পদ্ম-যূঁইয়ের বড় সাধ ছিল বাসর জাগবার, তারা আমার পাশে পড়ে রইল।

পদ্ম মুখ ঘুরিয়ে জাঁক করে বলে, সে কি বরমশায় তোমার ওই কালকের একটা রাত্রির বাসর ? যে বাসর সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায় ? কতদিন আর কতরাত্রি তিন বোনে পাশাপাশি পড়ে আছি বাসরে। মাছি ভনভন করে ঘায়ের জায়গায়, পোকা

কিলবিল করে। তারপর একদিন দেখি, তোমার শ্বশুরমশায় নাকে কাপড় জড়িয়ে বাড়ি ঢুকছে। দুয়োর-জানলা ভেঙে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বাড়ি ঢুকতে মুশকিল নেই, কাউকে এত্তেলা দিতে হয় না। একলা মানুষ চোরের মতন টিপিটিপি ঢুকে পড়ল। একেবারে দোতলায়।

চম্পা বলে, দোতলায় বাবার ঘরে দেয়ালের সঙ্গে আলমারি গাঁথা। চোরা-আলমারি—এমনি দেখে বোঝবার জো নেই। তার ভিতরে গয়নার বাক্স। মাখন মিস্তির সমস্ত জানত, কলকাতা থেকে গয়না কিনে এনে সে-ই নিজ হাতে রেখে দিয়েছিল। তার মত আপন কে ছিল আমাদের? দয়ালহরি দোতলার ঘরে এসে সকলের আগে আলমারিটা খুলে ফেলল। তিলেক খোঁজাখুঁজি নেই, একেবারে যেন হিসাব-করা ব্যাপার।

পদ্ম বলে, আলমারির কথা কে তাকে বলল? চাবি কে দিল? বলতে পার ওগো নতুন বর? আমাদের পরম আপন সেই মাখন মিস্তির। মাখনের কাজে-কর্মে জোগাড় দিয়েছিল তোমার শ্বশুর—তার ওই বখরা পেল। এক বাক্স ঝুটো গয়না। হি-হি-হি—

হেসে হেসে ফেটে পড়ে পদ্ম। চম্পা বলছে, তারপরেও দেখি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করছে। চশমা পরে এসেছে সেদিন, একটা সূঁচ অবধি চোখে এড়ায় না। দামি জিনিসপত্র লুঠ হয়ে গেছে, পাবে আর কোন্ ছাই! ওই যে হারমোনিয়াম তুমি বাজিয়ে থাক, মুঁইয়ের হারমোনিয়াম। ওটা বয়ে নিয়ে গেল সেইদিন। তবু ভাল, ঘরের জিনিসটা আবার আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে।

পদ্ম বলে, ছাতে উঠে দয়ালহরি চিলেকোঠার পাশে আমাদের পেয়ে গেল শেষটা। হাঁটু ভেঙে পাশে বসে নিরিখ করে দেখে। চম্পার কষ-গলা ফোলা আঙুল টিপে টিপে আংটি খুলে নিল। একটা কানপাশা আমার আগেই কোথা ছিটকে গেছে, এলো-খোঁপায় চাপা আছে আর একটা। ঠিক বের করেছে। জিনিসটা

ভাল—শুধু একটা বলেই তোমার বউ সেটা কানে পরে নি। মুণ্ডু ঘুরিয়ে ধরে হেঁচকা টানে আমার কানের নেত্তি ছিঁড়ে সেটা নিয়ে নিল। ছায়ার মানুষ না হলে কানের ছেঁড়াটুকু দেখাতে পারতাম।

যে-প্রশ্ন কত বন্ধুর কাছে জানিয়ে রেখেছি, তাই আমার মনে এসে গেল। জিজ্ঞাসা করি, রাজ্যটা তোমাদের কী রকম বল তো? সত্যি খবর দাও। যে যায়, গিয়ে তো একেবারে বোবা হয়ে পড়ে।

পদ্ম ঘাড় দুলিয়ে বলে, খাসা—চমৎকার! লোহার ডাণ্ডায় ব্যথা লাগে না। ছোরার ঘায়ে রক্ত পড়ে না। হালকা হয়ে ভেসে বেড়াই দিব্যি।

চম্পা কিন্তু হাহাকার করে ওঠেঃ না গো, কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমায়? মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস হয়ে ভেসে ভেসে আর পারি নে।

এসব হল রাতের কথা—কালরাত্রির ব্যাপার। সত্যি কিংবা মিথ্যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না। স্বপ্নে আর জাগরণে গোলমাল আমার। আমি বলব সত্যি, আপনারা বলবেন স্বপ্ন। তাই তো শুনতেই হবে কাহিনীর বাকিটুকু।

রাত গিয়ে দিনমান হয়। নতুন বউ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে এল। শ্বশুরের বাড়ি নয়, বরের অস্থায়ী বাসা—সাহেবকর্তার গোলঘর। তুখড় মেয়ে—এসেই কেমন এক লহমার মধ্যে জেনে-বুঝে দখল করে নিল সমস্ত। ফুলশয্যা হবে, হরিশকে নিয়ে নিজেই সব ব্যবস্থা করছে। খাট ঠেলে দিল ঘরের একপাশে, মেঝের উপরে বড় করে বিছানা। শহরের মতন পয়সা ফেলে এ জায়গায় ফুল মেলে না, হরিশকে পাঠাল ফুলের যোগাড়ে। বিরাজ-বুড়ির ছাঁচতলায় দোমুখি ফুল ফুটে আছে, দুর্গাবাড়ির বাগান খুঁজলে গাঁদা মিলতে পারে, খানাখন্দে রাস্তার

পগারে সাদা রাঙা দু-রকমের শাপলা পাওয়া যাবে। ওই হয়ে যাবে। নমো-নমো করে কাজ সারা। লোক বেশি আসছে না। এলেও মুশকিল। লাবণ্য বউ হয়ে বসল তো কে তাদের খাতির-যত্ন করে? হরিশের বউ আর পিসিকে আনবার কথা হয়েছিল, হরিশই বুঝি তুলেছিল কথাটা। আমিই চুপি চুপি মানা করে দিয়েছিঃ খবরদার, ঝামেলা বাড়াবি নে। টাকা-পয়সা নেই, ফুলশয্যায় সাকুল্যে পাঁচ টাকার নোট ছাড়ব একখানা, তার মধ্যেই সব। বিয়েতে শুধু মাত্র মেয়েই দিয়েছে, তা-ও ষোলআনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গওয়ালা মেয়ে নয়। খরচা পাঁচের বেশি আসে কোত্থেকে?

আমার কথা বুঝে হরিশ চুপ করে গিয়েছে। ওর কাছে এখনও প্রহেলিকা, কেন আমি ক্ষেপে গেলাম এই কন্যার জন্যে? অনেকের কাছেই। কিন্তু আমার কী জবাব? আমার জবাব কেউ মানবে না। উল্টে কেন শখ করে পাগল অপবাদ নিতে যাই?

ভেবেছিলাম, গুটি দশ-বারো মেয়ে আসবেন অন্তুতপক্ষে। তা-ও নয়। পুরুষ হলে পাওয়া যেত, কিন্তু ফুলশয্যা মেয়েদের ব্যাপার। দু-একজন যাঁরা এসেছিলেন, সন্ধ্যা হতে না হতে এটা-ওটা বলে সরে পড়লেন। এত বছরেও গোলবাড়ির বিভীষিকা যায় নি। ভূতের ভয়—রাত্রি বেশি হলেই ভূত-পেত্নীর মচ্ছব লেগে যাবে বাড়ির অন্দরে। আমার ভয় আরও বেশি। মাত্র দুটো প্রাণী নিয়ে ফুলশয্যা। বাসরঘরে গানটান গেয়ে মেয়েদের আটকে রেখে তবু অনেকক্ষণ বেঁচেছিলাম, আজকে লাবণ্যর অবাধ রাজ্যপাট।

একটা টেবিল আছে ঘরের কোণে, অফিসের কিছু পুরানো ফাইল। অভিনিবেশ-সহকারে তাই নিয়ে পড়েছি—পাতা ওল্টাচ্ছি, পড়ছি, লিখছি এটা-সেটা। হঠাৎ কী-যেন বিষম ব্যাপার ঘটে গেছে—এই পড়া ও লেখায় তিলেক ভুলচুক হলে কাল সকালে চাকরি চলে যাবে। কিন্তু ময়লা মেখে বসে থাকলেই

যমরাজ কিছু রেহাই করে না। বুঝতে পারি, আসা হল ঘরের ভিতর এইবারে। পদশব্দ পাই। ফুলশয্যার রাত, মনে পড়ছে?—বক্ষ দুরু-দুরু করেছিল আপনাদের, আকুলিবিকুলি করছিলেন বুকে তুলে নেবার জন্য। আমার ঠিক উল্টো, বুকের ধুকপুকুনিটা থেমে যাবার দাখিল। দরজা বন্ধ করল—আরে সর্বনাশ, বাইরের দরজা দালানের দরজা দু-দিকেরই। দুটো পথই বন্ধ। আসে টেবিলের দিকে—শাড়ি দেখেছি আড়চোখে চেয়ে। ঘাড় নিচু করে গভীর মনোযোগে আমি কাজে নিবিষ্ট, টেরই পাচ্ছি না আসে কি না কেউ। কাছে—আরও কাছে। এইবারে বুঝি দু-হাত আমার গলায় বেড় দিয়ে—আপনাদের শুনতে পাই, বাহুবল্লরী কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ে—আমার প্রাণবায়ুটুকু বাহুর ফাঁসে শেষ করে গো এইবার! এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, হায় হায়, কেউ নেই আমার—ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা···

না, যত নির্দয় ভেবেছিলাম ততদূর নয়। হাতের বেষ্টন নয়। মালা ফেলে দিল ঝুপ করে গলায়—গাঁদাফুলের মালা। মালারচনা করে রেখেছে—জানেও দেখি সব। সইয়ে সইয়ে দেখছে বোধ হয় —ফুলের মালা দিয়ে পরখ করছে।

এরই মধ্যে মন শক্ত করে ফাইল ঠেলে দিলাম একপাশে। লেখার খাতা বন্ধ করেছি। মরার চাইতে মরার ভাবনায় অশান্তি বেশি। ঘাড় উঁচু করি বেপরোয়াভাবে। লাবণ্য সামনের চেয়ারটায় বসেছে।

হেসে উঠল হি-হি করে: সাহস হল তবে তাকাতে? বউয়ের রূপ দেখছেন—প্রেম জমে আসছে, উ? দেখুন, নয়ন ভরে দেখে নিন।

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে আবার বলে, পুরুষ মানুষ বটে। লড়াইয়ে গেলে কেউ-কেটা হতে পারতেন। অত কী দেখেন আমার মুখে? আমার নিজের মুখ—আমি কিন্তু চেয়ে দেখতে ভরসা পাই নে। হাসপাতাল থেকে বসন্ত সেরে এসে একটা দিন

শুধু আয়না দেখেছিলাম। দেখে আঁতকে উঠে আয়না ছুঁড়ে ফেললাম। আর দেখি নে সেই থেকে। আপনি তো বেশ এতক্ষণ চেয়ে আছেন, মুখ ফেরান না, থুতু ফেলেন না।

একটা কিছু বলতে হয়—তাই বললাম, ইস, সারা মুখ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

যেন ভ্রমবশে একটা বড় গুণের কথা বাদ থেকে যাচ্ছে, এমনিভাবে লাবণ্য বলে, আর চোখ? বাঁ-চোখের মণি সাদা মার্বেলের মত—দেখতে পাচ্ছেন না? ডান চোখে হাত-চাপা দিলে অন্ধকার ছুনিয়া। যা-ই বলুন, এ বাহাছুরি বিধাতাপুরুষের নয়। জন্মের সময় তিনি এতদূর দেন নি। মা শীতলার কারুকর্ম —শিল-কাটাই করে দিলেন। আপনি কলকাতার, আমিও কলকাতার—উপমাটা বুঝবেন। শিল কাটাবে গো—বলে রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে, এক বাড়ি গিয়ে ঠুক-ঠুক করে ছেনি ধরে শিল কাটিতে বসে যায়, সেই ব্যাপার। বাঁ-চোখের উপরে ঠোক্করটা বেআন্দাজি পড়ে ঢেলা গলে গিয়ে নতুন এক বাহার খুলল।

চোখের পাতা বেশি করে মেলে উল্টানো ঢেলা ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বাকি চোখটা বিঘূর্ণিত করে কেমন-কেমন তাকাচ্ছে। এত কাছাকাছি সহ্য করতে পারি নে। বড্ড ঘুম পেয়েছে—এমনি-ভাবে হাই তুলে বিছানায় চলে যাই। লাবণ্যর কথা ছেদহীন চলেছে: মামী ছু-চোখে দেখতে পারে না। চব্বিশ ঘণ্টা শত্রুতা করত। বসন্ত হয়ে ঘুঁটে-কয়লার অন্ধকার ঘরে পড়ে ছিলাম, জানি পাঁচ-সাতটা দিনের ভিতর নিমতলার গঙ্গায় গিয়ে ঠাণ্ডা হব। মামী তা হতে দিল না, হাসপাতালে পাঠাল। আর কী আশ্চর্য, ডাক্তাররাও লাসঘরে চালান না করে সেরেস্থুরে গেটের বের করে দিল একদিন। ট্রেনের টিকিট কিনে পাকাপাকি গাঁয়ে পাঠাবার সময় মামী প্রাণ ভরে আশীর্বাদ দিয়ে গেল: আকাশের যত তারা, পাতালের যত বালি, তত তোর পরমায়ু হোক। সকলের বড় শত্রুতা সেধে গেল। কিন্তু যেটা চেয়েছিল, হয় কই? ছুয়োরে ছুয়োরে

লাথি-ঝাঁটা না খেয়ে উল্টে আমার ভাল ঘর-বর হয়ে গেল। মামীকে এত করে লিখলাম বিয়ের সময় আসবার জন্য। চোখে দেখে গিয়ে খাণ্ডবদাহনে জ্বলবে, জীবনে আর সোয়াস্তি পাবে না। সকল শোধ তুলে নেব ভেবেছিলাম, তা সে এলই না মোটে।

একটা চোখে তাকাতে তাকাতে লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠল। মামীকে না পেয়ে শোধ তুলে নেবার অন্য উপায় বুঝি ভেবে পেয়েছে। খাটের উপরের বালিশ এনে বিছানার মাথার দিকে রাখল। এবারে তার বালিশটা নিয়ে এসে রেখে দিল আমার বালিশের উপর। দু-বালিশ পর পর রেখে হাত ঘষছে। ধুলো-ময়লা ঝাড়ছে, না আদর বুলাচ্ছে বালিশের গায়ে?—পরের ব্যাপারের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

একটা কাজ করবে লাবণ্য? আমার একটা উপকার?

দেয়ালে টাঙানো বন্দুকটা নামিয়ে গুলি ভরলাম। লাবণ্য চুপচাপ দেখছে। আমিও চোখ তুলে তার দিকে দেখি এক-একবার। কী ঘৃণা উপচে পড়ছে কুৎসিত মুখের ওই চোখটা দিয়ে! আমার বুকের উপর আঙুল রেখে বলি, এইবারে—এইখানটায় বন্দুকের নল বসিয়ে ট্রিগার টিপে দাও।

ঘাড় নেড়ে লাবণ্য ঝেড়ে ফেলে দেয়: আমি পারব না।

খাটনির কিছু নয়। একটা আঙুলে চেপে দেওয়া একটুখানি।

এত যদি সহজ, আপনিই করুন সেটা। আমায় কেন?

অত বড় লম্বা নল। বুকে নল রাখলে ট্রিগার অবধি হাতই পৌঁছবে না। পিস্তল হলে হত।

বন্দুকেও হয়। কেন হবে না, কত জনে করে থাকে। নিজে মরতে হলে নলের মুখ বুকে রাখবেন না, থুতনির নীচে রাখুন। বন্দুক খাড়া করে পা দিয়ে ট্রিগার টিপে দেবেন, ব্যস। কাগজে পড়েছি। কায়দা বলে দিলাম, দেখুন এইবারে চেষ্টা করে।

অত্যন্ত সহজভাবে আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে একটু হেসে লাবণ্য বলে, আমি কেন করতে যাব? আমার তো উল্টো স্বার্থ।

আমার স্বামী হবার দায় থেকে পালাতে চাইছেন, সে সুবিধা আমি কেন করে দিতে যাব বলুন ?

বন্দুকের গুলি না ছেড়ে ঘুরন্ত চোখটা আমার দিকে তাক করেছে। শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্ত। ফুলশয্যাতেও নাকি আলো জ্বেলে রাখতে হয়। যে অলক্ষণ হয় হোকগে, প্রদীপ নিবিয়ে দিলাম আমি ফুঁ দিয়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি। অক্টোপাস আটখানা হাতের ভরে পিল পিল করে এগিয়ে আসে। কালো পাথরের মত ভারি অন্ধকার চারিদিক দিয়ে চেপে এসে পড়ছে। টুনুর কথা ভাবছি। যে বাবা-মা ছেলে বয়সে মারা গেছেন তাঁদের কথা…

দীপ-নেবানো গোলঘরে, বিশ্বাস করুন, হঠাৎ যেন ভিন্ন লোকে চলে গেলাম। সেই যেমন অসুখের সময়টা হয়েছিল। তখন আভাস মাত্র পেয়েছিলাম, আজকে কে যেন ফটক খুলে দিয়ে অন্ধকারে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। এই গোলবাড়ি, সরকারি চাকরি, বিয়ে-থাওয়া, আজকের করাল ফুলশয্যায় প্যাঁচে প্যাঁচে জড়ানো লাবণ্যের দেহের শিকল—সমস্ত অবাস্তব। এতক্ষণের আতঙ্কের বোঝা তুলোর মতন লঘু হয়ে গেল। মরণেও ঠিক এই রকম—ভুক্তভোগীর কথা শুনুন, পরলোকতাত্ত্বিকের আন্দাজি গবেষণা নয়—ভয়টা যতক্ষণ মরণ এসে না পৌঁছয়। এসে পড়লে আর কিছু নেই। বিশ্ব-সংসারে যা-কিছু এতকাল জেনে বুঝে আছি, সমস্ত ভুয়ো। ঠিক তেমনি ভুয়ো হয়ে গেল পলকের মধ্যে লাবণ্য সহ আমার এই জীবনটা। হাসি পাচ্ছে, কী বোকা আমি—এতকাল এইসব সত্য ভেবে এসেছি !…

দয়ালহরির সাড়া পাই : কই গো, ঘুমিয়ে পড়েছ তোমরা ? দেরি হয়ে গেল। দুয়োর খোল।

লাবণ্য উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিল। শাশুড়ি ঠাকরুন বর-কনের খাবার পাঠিয়েছেন। মেয়ে তো ফুলশয্যা

নিয়ে থাকবে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে তাদের ? খাবার তৈরি করে পাঠিয়েছেন তাই—থালায় বাটিতে রকমারি তরকারি, লুচি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরপুরিয়া, গোপালভোগ। এ সমস্ত দয়ালহরি বয়ে নিয়ে এসেছেন, আরও কত কী আছে পিছনে হরিশের হাতে। একা দয়ালহরি এত জিনিস কী করে আনেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি হরিশকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে-ও খেটেছে বড়বউয়ের সাথেসঙ্গে।

দয়ালহরি বললেন, বড়বউ দেরি করিয়ে দিল। ভোরবেলা থেকে সে রান্নাঘরে। একটি বারও বেরোয় নি। টানটাও বড্ড বেড়েছে ক'দিন, তার উপরে এই খাটনি। বলে, ক'পা হেঁটে গিয়ে মেয়ের একটু সংসার গুছিয়ে দেব, মেয়ের সুখশান্তি চোখে দেখে আসব, কিছুই তো পোড়া কপালে হল না। ফুলশয্যায় মানুষ কত রকম তত্ত্ব-তালাস করে।—ঘরে বসে গতরে খেটে ছু-খানা তরকারি রেঁধে দিচ্ছি শুধু।

বাধা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি : মেয়ের গা সাজিয়ে গয়না দেবেন বলেছিলেন—তার কী হল ?

দয়ালহরি আকাশ থেকে পড়লেন : আমি ?

জড়োয়া গয়না হীরে-মুক্তোয় গাঁথা। আপনারা তো পুরানো ঘর—গয়না গাদা হয়ে থাকে, ঘরের মধ্যে মাটির নীচে পোঁতা থাকে। কী আশ্চর্য, এতজনকে ডেকে ডেকে শোনালেন, এখন যে কিছুই মনে পড়ছে না।

বাপের দিক হয়ে লাবণ্য বলে, গয়না তো গায়ে পরবার। তাতে কোন্ লাভটা হত শুনি ? গয়নায় আমার ছেঁদা-ছেঁদা মুখ ভরাট হত ? ঢাকা পড়ত কানা বাঁ-চোখটা ?

হেসে উঠে বলি, খবর রাখি হোড়মশায়। সেই গয়না সমস্ত কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরে-মুক্তো কাচ।

খিক-খিক করে হাসতে লাগলাম, এই আমার মনে আছে। অমন কুৎসিত হাসি আমার মুখে বেরোয়, আগে কখনও জানতাম

না। এখনও বিশ্বাস করি নে। আমার হাসিই নয় আদপে, অন্য কেউ নিশ্চয় হেসে উঠেছিল আমার মুখ দিয়ে।

সে হাসি দেখে ভয় পেলেন দয়ালহরি। করুণ কণ্ঠে বলেন, দেব কোত্থেকে বাবা? মাখন মিত্তির বেইমানি করল। গ্রাস করল সব একাই। মেয়ের গয়না দেব, মেয়ের বিয়ের খরচপত্র করব, বাড়ির দেনা শুধব—সমস্ত বরবাদ। ক'টা দিন পরে—তুমি জান বাবা সমস্ত—ঘরবাড়ি ছেড়ে বড়বউ আর কাচ্চাবাচ্চার হাত ধরে পথে বেরুনো ছাড়া গতি নেই।

থামলেন একটু। তিক্ত হাসিতে সারা মুখ বীভৎস হয়ে গেল। বলছেন, মন্দ হবে না। সদরের একটা তেমাথা জায়গা দেখে রেখেছি। বড়বউয়ের হাত ধরে সেখানে নিয়ে বসিয়ে দেব। খোঁড়া মেয়েমানুষ, চেহারাখানা ওই, তার উপরে হাঁপানির টান—অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলো ঘিরে থাকবে চতুর্দিকে। ভিখারি সেজে বসতে হবে না—ভগবানই আপনা থেকে সব গুছিয়ে দিয়েছেন। তা ভেবে দেখলাম, ভালই হবে। শতেক ছ্যাঁচড়ামি করে যা রোজগার করি, এর চেয়ে অনেক ভাল।

আরও ভাল আছে। এর চেয়ে অনেক—অনেক ভাল।

বিমূঢ় হয়ে দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেন। বললাম, মরে যান না কেন একেবারে? তার চেয়ে ভাল আর নেই। এক কাজ করুন, আমায় মেরে দিন—আমি বেঁচে যাই। আর এত বড় মহৎ কাজ বৃথা যাবে না। সদাশয় সরকার বাহাদুর পিঠ পিঠ আপনাকেও মেরে পরোপকারের পুরস্কার দেবেন।

না বাবাজি, না। ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

ভয় পাচ্ছেন? আপনার মেয়ে কিন্তু এমনধারা নয়। গুলি ভরলাম, দেখল সে চেয়ে চেয়ে। গুলি করতেও পারে কিন্তু ভাবছে এক গুলিতে শেষ না করে দিনে-রাত্রে তিলে তিলে মারলে মজাটা বেশি। সেই জন্যে একবারে শেষ করতে চায় না।

হাতে বন্দুক দিলাম। বলি, টিপে দিন ঘোড়াটা।

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, উঁ?

দেখিয়ে দিতে হবে? আচ্ছা, দিন আমায়—

যন্ত্রচালিতের মত বন্দুক ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে। তারপরে কী হল, কেমন করে হল একেবারে ঝাপসা। শুধু একটি-বার দেখেছিলাম, শ্বশুর মশায় গোলঘরের রক্তাক্ত মেঝেয় গড়াচ্ছেন। বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

* * *

কত সহজ মৃত্যু। লহমার মধ্যে সমস্ত ঠাণ্ডা। কিন্তু আমায় নিয়ে বড্ড বেশি খেলাচ্ছে এরা। বিড়ালের যেমন ইঁদুর-শিকার। থাবার মধ্যে পেয়ে তারপরে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করতে দেয়। এক কামড়ে খেয়ে সুখ হয় না। ইঁদুর এদিক-ওদিক ছোটে, বেশি দূরে গেল তো মুখে করে কাছে নিয়ে এল। আবার ছোটে, আবার ধরে। শেষ কামড় তো আছেই। কিংবা ধরুন, ছিপে মাছ খেলানো। খেলিয়ে নিয়ে শেষে মোক্ষম টান। আমারও ঠিক তাই—ছোট-কোর্ট থেকে মেজ-কোর্ট। মেজ থেকে বড়য়। অগুন্তি সাক্ষিসাবুদ, হাকিম-উকিল, দু-পক্ষের জেরা-সাওয়াল, ভারি ভারি কেতাব খোলা কথায় কথায়—আর আড়গড়ার মধ্যে সকলের থেকে আলাদা রাজাধিরাজ আমি। ক্ষণে ক্ষণে সকলে তাকায় আমার দিকে, আমায় ঘিরে যাবতীয় আয়োজন। আত্মগৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আবার লজ্জাও লাগে—নাঃ, বাড়াবাড়ি করছে সামান্য এতটুকু কাজের জন্য। খুন তো করেছি একটিমাত্র মানুষ—তা-ও দয়ালহরি হোড়, যে লোক মানুষ কিংবা জন্তু তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আর যাঁরা এক সঙ্গে হাজার হাজার সাবাড় করছেন, তাঁদের তো কেউ ধর্মাধিকরণে নিয়ে এসে খাতির জমায় না। লড়াইয়ের ইয়োরোপ একটিবার দেখে আসুন। আমারও বন্ধুর মুখে শোনা অবশ্য। এ বাড়িতে তিন-শ মরেছে, ওই মাঠে সাত-শ, এই শহরে চল্লিশ হাজার। মানুষ, না ছারপোকা! ছারপোকাও এক-একবারে অতগুলো করে মারা

যায় না। সেই কাজ করে ফেলেন তাঁরা চক্ষের পলকে। কিংবা স্বদেশেও দেখেছিলেন সেই দাঙ্গার সময়টা। কলা-মুলোর মত কী রকম মানুষ কাটে। এক গোলবাড়িতেই কতগুলো গেল হিসাব করুন। সেই বীরবর্গের তুলনায় নিতান্ত কীটস্য কীট— আমায় নিয়ে এ ধুমধাম কেন ?

বউদি দেখা করতে এলেন বিকেলবেলা। টুনুও আছে। রোজ আসছেন। দেখাশুনোর নিয়মকানুন শিথিল করে দিয়েছে ক'দিন থেকে, খাতিরটা বড্ড বেড়েছে। কলকাতা থেকে এসে ছোট্ট এক বাসা নিয়ে আছেন ওঁরা। সাবরেজিস্ট্রার হয়ে এই জায়গায় শিক্ষানবিশি করে গেছি মাস দুয়েক—চেনা জায়গা। বাসাটা চোখে দেখে যেতে পারলাম না, কিন্তু দীঘির পাড়ে জিমনাস্টিক-মাঠের পাশে—জায়গাটা বুঝতে পারছি। আর কি বউদি, ঝামেলা মিটে এল এইবারে। কাল-পরশুর মধ্যে বাসা ছেড়ে দিয়ে সবসুদ্ধ আবার কলকাতায় ফিরতে পারবে। পরশু নয়, খুব সম্ভব কালই। কাল আর তোমাদের দেখা করতে আসতে হবে না ; সেল তখন ফাঁকা। বাড়িওয়ালাকে বলে রেখেছ, বাসা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছ তোমরা ?

বউদির দু-চোখ রাঙা। কেঁদে কেঁদে রাঙা করেছেন। আমার কথায় আবার তাঁর চোখ ভরে গেল। মাথার কাপড় লম্বা করে টেনে দিলেন, সেকালে লজ্জাবতী বউরা যেমন করত। এখন অবশ্য লজ্জার কারণে নয়, ভয়। আমার জন্যে ভয় কতকটা আছে— কান্না দেখলে আকুল হয়ে পড়ব, এইরকম হয়তো ভাবছেন। কিন্তু ভয় বেশি টুনুকে নিয়ে। প্রথমটা সে ডুকরে কেঁদে উঠবে, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে সারাক্ষণ। ছেলের এখন বোঝবার বুদ্ধি হয়েছে। বউদির কান্না দেখে প্রথম দিন সে কী কাণ্ড —টুনুকে থামানো যায় না, ছটফট করে কাটা-কবুতরের মত : কাকামণি যাব, কাকু তুমি ওখানে কেন, বাইরে চলে এস। আমি কোলে উঠব। বউদি চোখ মুছে ফেললেন তাড়াতাড়ি, আর

আমি বিষম আনন্দে হো-হো করে হাসি। ছেলে শান্ত হয় না। সেদিন থেকে বউদি টুনুর সামনে কিছুতে চোখের জল ফেলেন না। কী রকম মজা হয়েছে—যা-ই কিছু আমি বলি, কাঁদবার জো নেই। দৈবাৎ জল এসে গেলে চোখ ঢেকে ফেলতে হবে। টুনুর ডাগর চক্ষু-তারকা দুটো পাহারা দিয়ে ঘুরছে। আমার হাসি। দেখে টুনুও হাসে, কিন্তু তখনও মায়ের মুখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মুখ আঁধার কি না মায়ের, চোখে জলের চিহ্ন কি না।

কতদিন কাকামণি তোমার কাছে যাই নি বল তো? কতদিন কাছে শুই নি, এক সঙ্গে বেড়াই নি?

তুমি বড় হয়েছ কিনা টুনুমণি, ভারিক্কি হয়েছ। বড় হয়ে গিয়ে তুমিও আর আগের মতন করে হাসতে পার না।

খিলখিল খিলখিল উছল জলস্রোতের হাসি হাসত। ঠোঁটে মুখে বাঁধ পড়ে গেছে—ঝিরঝিরে একটু-একটু হাসি এখন। মনের দুঃখটা গোপনে বলি আপনাদের—টুনুকে বুকে নিতে পারি নে, কাঁধে তুলতে পারি নে—সাদা রঙ-করা কঠিন গরাদ আমাদের মাঝে। আমারও এখনকার একটিমাত্র দুঃখ এই।

কত রকমের খাবার করে নিয়ে আসেন বউদি। বাড়ির বানানো, দোকানেরও একটা দুটো। মনে গেঁথে রেখেছেন—কোন্ কোন্ বস্তু আমার পছন্দ, কোন্‌টা তার মধ্যে খাওয়া হয় নি অনেকদিন। আইন হঠাৎ আজ বড্ড বেশি সদয়। আর একটা ব্যাপার ঠাহর হল—পাশের দোতলা ওয়ার্ডে উপরের ঘরগুলো খালি করে ফেলেছে। বছরে বারকয়েক শুনেছি ঘটে থাকে এমনি—দোতলার যত কয়েদি ভূতলে নামিয়ে দেয়। নিয়ম হল, ফাঁসির তারিখ আগে বলবে না। মাত্র আসামী জানবে ঘণ্টা কয়েক আগে। কিন্তু চোখ দুটো নিতান্ত অন্ধ না হলে জানতে কিছু আটকায় না। দোতলা থেকে ফাঁসির জায়গা দেখা যায়। দোতলা খালি করে দিল—তার মানে, তুমি যে জানলা খুলে নিখরচায় মজা

দেখবে, সেটা হচ্ছে না। অতএব অনুমান করা যায়, মজাটা জমবে আজকেই। রাত্রিবেলা ক্ষেপে ক্ষেপে কর্মকর্তারা উদয় হবেন যথানিয়মে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে ইংরেজি ও বাংলায় ভাল করে সমঝে দিয়ে যাবেন, আমায় ফাঁসিতে ঝোলানো হবে যতক্ষণ না মৃত্যু হচ্ছে। মাইনে-করা ঠাকুরমশায় উত্তম উত্তম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শোনাবেন বলির পাঁঠার কানে পুরুতের মন্ত্র শোনাবার মত। শেষরাত্রে এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে, স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরাবে। বলির পাঁঠাকেও হাড়িকাঠে দেবার আগে স্নান করানোর বিধি। বলিদানের ব্যাপার দেখেই বোধ হয় এই সব নিয়ম হয়েছে। কী সমারোহ তারপরে। জহ্লাদ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেলখানার কেষ্টবিষ্টু সবাই চলে এসেছে—বন্দুক তুলে সারবন্দী এ-ও একরকম গার্ড-অব-অনার। এমন একটা ব্যাপার কি ওই সব চোর পকেটমার ছ্যাঁচড়া কয়েদি-গুলোকে দেখতে দেবে? দেখতে চাও, নিজে ভারিক্কি রকমের কিছু করে আদালতের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে চলে এস ফাঁসি-সেলে। দু-চোখ ভরে নিজের উপর দিয়ে দেখো তখন।

যাকগে, যাকগে। খাওয়াচ্ছেন আমায় বউদি। নাছোড়বান্দা হয়ে বড্ড বেশি খাওয়াচ্ছেন। বাটি থেকে একটা একটা করে তুলে দিচ্ছেন হাতে। মালপো ক'খানা। মনে আছে বউদি, নতুন বউ এসে পাকপ্রণালী পড়ে তুমি মালপো বানিয়েছিলে? হাসিঠাট্টা করল সকলে, তোমার সেই মালপো খাওয়ার মানুষ মেলে না। একেবারে ক্ষেপে গেলে তুমি—কতবার জিনিসপত্র নষ্ট করে এটা-ওটা যোগ করে পরিমাণ কম-বেশি করে শেষটা যে বস্তু উতরাল, ভুবনে তার জুড়ি নেই। আজকে যা খাইয়ে গেলে বউদি, এক মাস এর স্বাদ লেগে থাকবে মুখে।

দাদা আর লাবণ্য আসছে। দাদা, মনে হচ্ছে, বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন লাবণ্যকে। গেট অবধি এসে মনে পড়ে গেল—দু-জনে আবার বেরিয়ে গেলেন সেন্ট কিনতে। ভাল হল। সেন্টের শিশি

সময় থাকতে যদি হাতে পৌঁছয়, আমার নতুন পোশাকটায় সেন্ট মেখে কিঞ্চিৎ বাবুয়ানা করা যাবে।

লাবণ্য বউদির পাশে এসে দাঁড়াল। বউদি, জায়ের বড় সাধ ছিল তোমার। সারা কলকাতা মেয়ে দেখে দেখে বেড়িয়েছ। হুই জায়ে সাধ মিটিয়ে সংসার কর এখন। লাবণ্য সিঁথির উপর চওড়া করে সিঁছুর টেনেছে। চুলে ঢাকা পড়ে গিয়ে পাছে আমার নজরে না আসে। অথবা পরে আর পরতে পাবে না—আক্রোশ ভরে বেশি করে পরে আমায় দেখাচ্ছে। বিরাটগড় থেকে এইখানে লাবণ্যকে আনিয়েছেন, সকলে এক বাসায় আছেন। নীচের কোর্ট থেকেই লাবণ্য যতদূর আমার সঙ্গে শত্রুতা সেধেছে। পরিষ্কার মিছে কথা বলল, ঈশ্বরের নাম নিয়ে হলপ করে বলল, দয়ালহরিকে আমি মারি নি। কে মেরেছে তা সে জানে না। জানালা থেকে গুলি এসে বিঁধল। পাটোয়ারি লোক, টোর্নির ব্যবসা, সম্পত্তি ও টাকাকড়ি ঠকানোর ব্যাপারে কত লোকের আক্রোশ রয়েছে—কে মেরে ফেলেছে কে জানে? করুণার্দ্র হয়ে নিজে উপযাচক হয়ে আমি তাঁর মেয়ে বিয়ে করেছি, হঠাৎ কী কারণ ঘটতে পারে ফুলশয্যার সময়ে শ্বশুরকে খুন করার? সরকারি উকিলের ধমক খেয়েও লাবণ্য ভড়কে যায় নি একটুকু। সাংঘাতিক মেয়ে—বেঁচেবর্তে থাকে তো বাপকে ছাড়িয়ে যাবে ফেরেব্বাজিতে। ধমক খেয়ে আরও জোর দিয়ে বলল, হরিশ আর বাবা খাবার নিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে, আমি আসন পাতছি—ঠিক সেই সময় খোলা দরজার বাইরে হুম করে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার লুটিয়ে পড়লেন। বাবার খুন নিয়ে মিথ্যে বলতে পারি আমি?

এই সব বলছে, তার মধ্যে অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হেসে নিল একবার। কাঠগড়ায় আমার মাথার চুল অবধি খাড়া হয়ে ওঠে। কথার চেয়েও লাবণ্যর হাসির মানে প্রাঞ্জল। হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে তো সরে পড়তে দেবে না—তারই প্রাণপণ চেষ্টা। প্রায় পৌরাণিক সাবিত্রী—যমের মুখ অবধি

স্বামীকে তাড়া করে ফিরছে। কী বিপদ বুঝে দেখুন হতভাগা স্বামীর—মরে গেছি, তা সত্ত্বেও বউ ষাঁড়ের গলকম্বলের মত ঝুলতে ঝুলতে চলল। নিজে তো অপদার্থ ভীতু মেয়ে। বিষ খায় নি, জলে ঝাঁপ দেয় নি, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে নি—কিছুই করতে পারল না। আমি যে সাহস করে ওই সব আদিম পন্থা না নিয়ে খবরের কাগজে নাম উঠিয়ে ধুমধাড়াক্কা করে চলে যাচ্ছি, শতেক রকমে তার বাগড়া দিয়েছে। জজের মুখোমুখি বুক চিতিয়ে আমি বললাম, দয়ালহরি চতুর মানুষ। আইন দিয়ে কোনদিন তোমরা ছুঁতে পারতে না। যারা আইন করে তাদের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি রাখে সে। তোমাদের কাজটা আমি সোজাসুজি সেরে দিলাম। হেন স্বীকারোক্তির পরেও আমার উকিল হাল ছাড়ে না। বলে, আসামির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বদ্ধ উন্মাদ। ডাক্তার দেখিয়ে পাগলাগারদে রাখতে হবে। এই সব। কাণ্ড দেখুন দিকি! শত্রুতায় কেউ এরা কম যায় না।

টুনু হাত বাড়াল গরাদের ভিতর দিয়ে। তুলতুলে হাত মুঠোয় ভরে নিই। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় টুনু, কিন্তু হবে কী করে? গরাদগুলো রাক্ষসের দাঁত—সাদা সাদা লম্বা দাঁত মেলে রাক্ষস হাঁ করে রয়েছে। বড্ড ভয় টুনুমণি, তুমি সরে যাও। রাত হয়েছে—রাক্ষসেরা বাঘেরা ভূতেরা পুলিসেরা এবারে সব রোঁদে বেরুবে। বাড়ি চলে যাও সকলে তোমরা।

বললে হয়তো ব্যবস্থা করে দিত। টুনুকে ভিতরে নিয়ে এসে, কিংবা যেমন ভাবে হোক বুকে তুলতে দিত আমায় একবার। জেলর বড় ভাল লোক। ডাক্তারবাবু ভাল। সব মানুষই ভাল, সকলে বড্ড আপন আজকে। ভালবাসার চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সব অপ্রীতি মুছে গেল যেন রাতারাতি। হঠাৎ রাজাধিরাজ হয়ে গেছি। জল খাব বলে হাত তুলেছিলাম, ছুটোছুটি করে ঝকঝকে সাদা ফেরোয় জল এনে দিল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা

করেন, কী ইচ্ছে তোমার, কোন্ জিনিসটা চাই বল? যার মুখে তাকাই, মনে হয় চোখ ছলছল করছে। কেন হে, ব্যাপারটা কী? সম্ভ্রম—বীরপূজা? তোমরা পার না, আমি এই কেমন ড্যাংড্যাং কার চলে যাচ্ছি? আর এক হতে পারে—বড় চাকরি নিয়ে চাকরিস্থলে চলেছি, কানে শুনতে পেয়ে পরম শত্রুও যেমন ভালবাসায় গদগদ হয়ে ওঠে। চলে যাচ্ছি—খাতির সেইজন্যে। যদি বলি, না ভাই, যাওয়াটা বাতিল হল শেষ অবধি, অর্থাৎ আমি দয়া-ভিক্ষা না চাওয়া সত্ত্বেও দিল্লি থেকে মার্জনার টেলিগ্রাম এসে পড়ল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সকলের নিজ-মূর্তি বেরিয়ে পড়বে। কুটুম্বরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, আপদবালাই বিদেয় হয় না কেন? আবার জামাটা যে-ই সত্যি সত্যি গায়ে চড়িয়েছি, দেখতে পাবেন, খাতির করে পান সেজে এনে মুখের কাছে ধরছে। তেমনি ব্যাপার।

দিগন্তের অন্ধকারে ওঁরা তিনজন টুনুর হাত ধরে চলে গেলেন। আর আসবেন না। কোনদিকে একটা মানুষ দেখতে পাই নে, ওই পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল ওয়ার্ডারটি ছাড়া। রয়ে গেল—মনের মধ্যে আমার কত মানুষজনের আনাগোনা। দেখুন, মহাব্যোমে স্পুটনিক ছাড়ুন আর যাই করুন, মনের শক্তির ধারেকাছেও যেতে পারছেন না। উপমা জুড়ে ভারিক্কি করে বলে থাকেন মনোরথ—চক্ষের পলক ফেলতে যে সময় লাগে তার ভিতরে, কোন্ রথ বলুন তো এমনধারা বেড়াতে পারে ভূত-ভবিষ্যতের হাজার-লক্ষ বছর পার হয়ে?

আমি যখন ছোট। ওই টুনুর মতন—উঁহু, টুনুর চেয়ে বড়ই হব কিছু। বাড়ির আটক মানতে চাই নে কিছুতে। ছুটে ছুটে বাইরের উঠানে যাই, উঠান পেরিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়াই। তবু কারও নজর পড়ল না তো ফটক পার হয়ে জাঙাল ছাড়িয়ে গুটগুট করে পা ফেলে বিলের ধারে চৌমাথা অবধি যাই। একদিন বিলেও নেমেছিলাম, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চলে আসি। এখন খুব বড়

হয়ে গেছি কিনা—অজানা বলে আজ দেখুন একটুও আর ভয় করছে না।

সেকালে আমাদের গাঁয়ের এক সন্ধ্যা। গৃহস্থবাড়ির ঘরে ঘরে দীপ দেখাচ্ছে, শাখ বাজছে—আজকের জেলখানার এই নিষ্কর্মা সন্ধ্যাবেলা নয়। মেঘ করেছে—আকাশের দিকে চেয়ে মাকে বারংবার বলি, বাবা কখন আসবে ? এত দেরি—আসে না কেন বাবা এখনও ? [আচ্ছা, বাবা সেই মৃত্যুপারের দেশে ঠিক এই সময়ে মাকেও তো জিজ্ঞাসা করতে পারে : আর কত ঘুমোবে খোকা ? জাগছে না কেন ?]

মা প্রবোধ দিলেন, এক্ষুণি এসে যাবেন।

বৃষ্টি হবে ঝড় হবে, গাছপালা সব ভেঙে পড়বে—

তার আগেই পৌঁছবেন।

কেউ না দেখে—কেউ না টের পায়, এমনি এক নিরালা জায়গায় গিয়ে সেদিন বারংবার আমি আকাশের কাছে মাথা কুটেছিলাম : নারায়ণ, কেষ্ট-রাধা, বাবা পাঁচপীর, হে মা শীতলা, আমার বাবা এক্ষুণি ফিরে আসুক—মোটে দেরি না হয়। তোমা-দের হরির লুঠ দেব।

ছোট-পিসি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় একটা সিকি হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিকিটা সরিয়ে রেখেছি লম্বা বিস্কুটের কৌটোয় কড়ে-পুতুলগুলোর নীচে। সেই সঙ্গতির জোরেই যাবতীয় ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে খুশি করবার ভরসা রাখি।

আরও মেঘ জমেছে, ঝিলিক দিচ্ছে মেঘ চিরে চিরে। আমাদের পাড়াটা ঘিরে গড়খাই—নারায়ণকোঠা, সেই গড়খাইয়ের একেবারে কিনারে। এর উঠান ওর কানাচ দিয়ে যেতে হয়। কাঁসর-ঘণ্টা বাজে—সেই দূরের গাঁয়ে সন্ধ্যাবেলা আজকেও হয়তো বাজছে তেমনি। আসন্ন দুর্যোগে মাকে বলে বেরনো যাবে না—না বলেই তাই টিপি-টিপি চলে যাই সেখানে।

থমথম করছে চারিদিকে, হাওয়া নেই। ঠাকুরের শীতল-ভোগ

হচ্ছে, ধূপ-ধুনোর গন্ধে সহজ ভাবে দম নেওয়া দায়। এই সময়টা প্রায়ই আমি এসে সতৃষ্ণ চোখে পুজো দেখি। পুজো অন্তে প্রসাদ—অতএব ঠিক সময়টির আগে এসে পড়লে চুপচাপ শেষ অবধি দেখতেই হবে। আজ কিন্তু প্রসাদের লোভে নয়। বাবাকে এনে দাও ঠাকুর, বাবা যেন দেরি না করে! ঝড়-বাতাসে কিছু না হয় যেন আমার বাবার! ঠাকুর, রাগ না কর তো তোমার প্রসাদ অবধি দাঁড়িয়ে থাকতেও চাই নে। গাঙের ঘাটে বাবা এল কি না দেখে আসি।

ঠাকুর-দেবতারা কী জীবন্ত ছিলেন সেই আমার ছোটবেলায়! সমাজের ছেলেবেলাতেও ঠিক অমনি। সেদিন ভারি এক দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম। কেউ জানে না—শুধু নারায়ণ ঠাকুর আর আমি। এক দৌড়ে চলে গেলাম গাঙ অবধি। রাত হয়ে গেছে, মেঘভরা আকাশের নীচে ঘনকালো অন্ধকার। মানুষ নেই কোন-দিকে—অন্ধকার ফুঁড়ে নজর পৌঁছয় না, আছে কি না কেউ বলাও যায় না ঠিক করে। তার উপরে কবিরাজের ভিটের কসাড় বাঁশ-বাগান। দল বেঁধে যেতেই দিনমানেও গা ছমছম করে। কবিরাজের নির্বংশ বাড়ির সেকালের তাঁরা সব বাঁশঝাড়ের দুর্নিরীক্ষ চূড়ায় চূড়ায় বিচরণ করেন। ছেলেমানুষ তো আমি—তখন বড্ড ভয় পেতাম। আমায় দেখে তাঁদেরও যেন টনক নড়ে ওঠে, কটর-কটর-কট এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে আওয়াজ তুলে ভয় দেখান। হঠাৎ বা একটা বাঁশ নুইয়ে নিয়ে আসেন একেবারে মাথার উপরে। দিনদুপুরে এই অবস্থা, কিন্তু সেই রাত্রিবেলা বাবার ভাবনায় হুঁশজ্ঞান ছিল না, ছুটতে ছুটতে গাঙের ঘাটে দাঁড়াই। গাঙের উপরে একটা নৌকো নেই। অশ্বত্থতলায় জলের মধ্যে ঝুরি নেমে গেছে, তার ভিতরে গোটা কয়েক ডিঙি। দুর্যোগ দেখে মুখ-লুকিয়ে যেন পালিয়ে বসে আছে।

এক মাঝি দেখতে পেয়ে বলে, বাড়ি যাও খোকা, একা-একা ঘুরছ কেন? বাতাস উঠবে।

আমার বাবা—

তোমার বাবা বুঝি নৌকোয়? তা কান্না কিসের? নৌকো কোনখানে বেঁধে রেখেছে—মেঘ কেটে গেলে ছাড়বে। তুমি ঘরে যাও, ঘরের লোক ভাবছে।

তখন চমক লাগে। মা ঠিক খোঁজাখুঁজি করছে। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এইবার। দৈত্যের একটা দল কোথায় বুঝি আটকানো ছিল—ছাড়া পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়েছে। দাপাদাপি লাগিয়েছে—আমাদের ঘরবাড়ি বাগবাগিচা লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

ভিজে কাপড়চোপড় ভিজে চুল ভিজে গা-হাত-পা, ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলাম। মা দেখতে পেলে তো রক্ষে থাকবে না—উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরে মা রাঁধুনি-মাসির সঙ্গে কি বকাবকি করছে। আমি বাড়ি নেই, কিচ্ছু মা টের পায় নি। কাপড় ছেড়ে গায়ের জল মুছে দিব্যি আবার ভালমানুষ ছেলে—সেই সময় মা এঘরে এলেন। দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলি, কখন আসবে বাবা—আর কতক্ষণ?

ঘুমব না, কিছুতে না—যতক্ষণ না বাবা ফিরে আসে। চোখ ড্যাবড্যাব করে আছি। আর ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ছি মনে মনে: আমার বাবার গায়ে ঝড়বৃষ্টি না লাগে, এক্ষুণি যেন বাড়ি আসে। এক্ষুণি—এই আমি জেগে থাকতে থাকতে।

কিন্তু ঘুমে চোখ ভেঙে আসে, ঠেকানো যায় না। কখন ঘুমিয়ে গেছি—রাত দুপুরে বাবা এসে আমায় নিয়ে শুয়েছে, আমি কিছু জানি নে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছি।

এবারে ঠাকুর কথা শুনলেন। কিন্তু আর একদিন কত সাধ্যসাধনা করলাম, কানে নিলেন না তিনি। বাবা যেদিন মারা গেলেন। পাড়ার লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়েছে বিকাল থেকে। বাবার গলায় শ্লেষ্মা-আটকানো ঘড়ঘড় আওয়াজ। চোখ বুজে

আছেন। পাখার হাওয়া করছেন বড়-পিসিমা শিয়রে বসে। বুকে পুরানো-ঘি মালিশ করছেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশায়ের প্রিয় ছোট ভাই—এক-একবার বিছানার ধারে আসছেন, ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। এত কষ্ট চোখে দেখতে পারেন না। জ্যাঠামশায়ের সেই আসা এবং ছুটে যাওয়া স্পষ্ট মনে রয়ে গেছে আজও।

জ্ঞাতিদের একজন এসে বলছেন, চিনতে পার, ও ছোড়দা? কষ্ট হচ্ছে খুব? বাবা চোখ মেললেন একবার—সাদা কাচের মত মণি। জবাব দেবার চেষ্টাও করলেন না। আবার আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির আশেপাশে কাল-কপাটির পাতা মুদে আসে যেমন। অশ্বিনীর অনেক রকম মুষ্টি-যোগ জানা আছে। বলে, শ্বেত-আকন্দের পাতার সেঁক দিলে উদ্বেগ কমবে। আরাম পাবেন। কাচের চৌখুপির ভিতর টেমি ভরে অশ্বিনী বেরুল, কোথায় শ্বেত-আকন্দ আছে খুঁজে-পেতে আনতে।

ধনঞ্জয় কবিরাজ বিকাল থেকে হাজির আছেন। সূচিকাভরণ হয়েছে তিনবার, ফল পাওয়া যায় না। ঘুমে আমি ঢুলে ঢুলে পড়ছি। এত মানুষ বাড়িতে, আঁধার-মুখে চুপিসাড়ে এতসব কাজ-কর্ম চলেছে—জেগে থাকা আমারও দরকার। কিন্তু পারি কই? হাই উঠছে, বসে থাকতে পারি নে আর। পশ্চিমের দালানে শুয়ে পড়েছি। বাড়ির সব ছেলে-মেয়ে ঘুমুচ্ছে অকাতরে। তাদের বাপের তো অসুখ নয়—তারা কেন ঘুমবে না? আমার ঘুমানো অন্যায়।

সেই আর একদিনের মত ঠাকুরের কাছে মনে মনে কান্নাকাটি করছি: বাবাকে ভাল করে দাও। রাতের মধ্যেই সেরে ওঠেন যেন, গলার ওই টান না থাকে। ঘুম থেকে উঠে যেন দেখতে পাই, বাবার সব কষ্ট সেরে গেছে, বাবা হাসছেন।

কত রাত্রি জানি না, কে যেন আমায় টেনে তুলল বিছানা থেকে। খোলা বারাণ্ডায় বাবাকে বের করে এনেছে। অনেক

মানুষ মিলে ভীষণ কণ্ঠে নাম শোনাচ্ছে বাবার কানের কাছে মাথা ঝুঁকে পড়ে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে—হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। উঃ, ঠাকুরদেবতার নাম কী ভয়ঙ্কর সময়বিশেষে! কান্নার রোল চারিদিকে। মড়ার এদিকে-সেদিকে গোটা দুই-তিন ক্ষীণ আলো, বাকি সব জায়গা অন্ধকারে থমথম করছে। কাঁদতে কাঁদতে বড়পিসিমাই বোধ হয় আমায় কোলে করে বাবার পায়ের দিকে নিয়ে গেলেন। দাদাও সেখানে। ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে জলে ভরতি করেছে। অন্তর্জলী। দাদাকে কে বলল, পা দুটো ডুবিয়ে দে জলের মধ্যে। আমায় বলে, তুইও ধর্ পা। আমার ইচ্ছা পা ধরবার নয়, বাবার মুখ দেখবার। যে-মুখে কত আদরের কথা শুনেছি। সেই হাতখানা একটু ছোঁব, যে-হাত বাবা পিঠের উপরে বেড় দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতেন। হাউহাউ করে কাঁদছি। সকলে কাঁদছে—পরম শত্রু এসে দাঁড়ালেও এই আসরে কাঁদতে হবে। জ্যাঠামশায়ের কাছে নিয়ে গেল, দু-হাতে টেনে নিয়ে তিনি বুকে চেপে ধরলেন। গম্ভীর মানুষ, এমন ভাব আর কখনও দেখি নি, ভেঙে পড়েছেন। বলছেন, কাঁদিস নে। আমি রয়েছি, সকলে রয়েছে। যে চলে গেল, আপদবালাই নিয়ে যাক চলে। বয়ে গেল।

তখন আমার বেশ ভাল লাগছে। বাবা গিয়ে হঠাৎ খাতির বেড়েছে বাড়িসুদ্ধ সকলের কাছে। এত বড় ছেলে তবু কোলে কোলে ঘুরতে লাগলাম।

তার পরদিন দুপুরবেলা। বাসি-মড়া রয়েছে পড়ে। চারপো দোষ পেয়েছে, প্রাচিত্তির না হওয়া পর্যন্ত মড়ায় কেউ কাঁধ দেবে না। সেই সব হতে হতে বেলা দুপুর। রীতকর্ম সমাধা করে শ্মশানযাত্রার তোড়জোড় হচ্ছে। ছোট মানুষ আমায় যেতে দেবে না, দাদা যাচ্ছেন। মড়া কাঁধে তুলে হরিধ্বনি দিচ্ছে: বল হরি, হরিবোল! এমনি গা-কেঁপে-ওঠা ঈশ্বরের নাম কেন যে করে মানুষ!

দিদি আর আমি দক্ষিণের ঘরে দরজার উপরে বসে বলাবলি করছি, বাবা আর আসবে না, কোনদিনও না। না দিদি?

সেই দিদি কবে মারা গেছে! কে কে মরেছে, আঙুল গুনে দেখি। মা, বড়-পিসিমা, ধনঞ্জয়-কবিরাজ, অশ্বিনী, জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা—বাবার মৃত্যু ঠেকাতে খুব যাঁরা ছুটোছুটি করেছিলেন, নিজেরাই গেছেন এখন। ভাবতে গিয়ে থই পাওয়া যায় না। উঃ, কত মরেছে! ফাঁসি না হয়ে বেঁচেবর্তে থাকলে আরও কত কত মানুষের মরা দেখতাম! ছেলেবেলার সব চেয়ে বড় বন্ধু সেই যে প্রভাস গাছ থেকে পড়ে মরল—তার সঙ্গে চুক্তি ছিল, যে আগে যাবে, যেমন করে হোক খবরটা জানিয়ে দেবে ওদিককার। মরার পরে হতভাগা প্রভাস বেমালুম সব ভুলে মেরে দিল। গিয়ে যদি দেখা পাই, বোঝাপড়া সেই সময়। থাবড়া কষে দেব পিঠে। না, তারও উপায় নেই। পিঠে তো লাগবে না, আমার হাতই মোটে উঠবে না—চম্পা যার জন্যে হাহাকার করে। অতএব বেঁচে গেলি রে প্রভাস। তোদের বিস্মৃতির কারণটাও ধরি-ধরি করছি এতদিনে। আমাদের গাঁয়ের ক্ষুদিনাপিতানী ছেলের যে ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে বিচার চেয়ে চেয়ে বেড়াত। দশ দুয়োরে দাসীবৃত্তি চেড়িবৃত্তি করে ছেলে মানুষ করল; লায়েক হয়ে ছেলে শহরে গেল রুজিরোজগারের ধান্দায়। আর আসে না, খবরবাদ দেয় না। ডাকিনী শহর জাদু করেছে ক্ষুদির ছেলেকে, দুঃখী মাকে সে ভুলে গেছে। প্রভাসেরও ঠিক তাই। স্বচ্ছন্দ লঘু আরাম পেয়ে কাঁটা-কাঁকরের ধরিত্রীর দিকে নিচু হয়ে তাকাতে মন চায় না, ঘেন্না করে।

সেই এক সময়ে বাবার জন্য ঠাকুরের কাছে দরবার করেছি—টুলুরও সেই বয়স—হয়তো সে-ও কান্নাকাটি করছে খোদাতালা-ঈশ্বর-গড সকলের কাছে। কতই আজব কাণ্ড ঘটে দুনিয়ায়! ভাবনার পায়ে কেউ তো শিকল দেয় নি—ধরুন, তাই একটা হল। জেলখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল হঠাৎ এক ভূমিকম্পে। ইট-লোহা-

রাবিশের স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ধরুন, জিমন্যাস্টিক-মাঠের পাশে একতলা বাসাবাড়ির জানলায় গিয়ে ডাক দিলাম, ও টুনু, ঘুমুচ্ছ ?

আমার পুরনো রসিকতা : ঘুমিয়ে থাক তো টুনুমণি, 'হ্যাঁ' বলে জবাব দাও।···

জেল-ফটকের পেটা ঘড়ি ঢং করে একবার বাজে। লোহার গরাদ-ঘেরা আমার এই সর্বশেষ রাত্রি। বুদ্ধিমান বলে আমার নামডাক—ধরাধরির লোক না থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকরি পেয়েছি, এই নিরিখে বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে। এত বছর ধরে গড়ে-তোলা সেই আমার সমস্ত বোধ-চেতনা ভোররাত্রে নিবে যাবে সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করার মতন। তারপর ? আপনারা হাতড়ে বেড়ান সেই পরের ব্যাপারটা সঠিক বোঝবার জন্য। কত পণ্ডিত কত রকম বলেন—বস্তা বস্তা কথার কচকচি। সঠিক বার্তা আমিই শুধু জেনেবুঝে আছি। মহাব্যোমের কোন এক চলিষ্ণু জগতে গ্রহ-তারকার মত ঘুরতে ঘুরতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই। তন্দ্রার ঘোরে ছোট এক পৃথিবী, সেই পৃথিবীর মধ্যে ততোধিক ছোট এক সংসারের কল্পনা। ক্ষণিকের ব্যাপার, জলের দাগের মত এক লহমায় তার সকল চিহ্ন মুছে যায়। তা হলে দেখুন, মৃত্যুর উল্টো মানে—সুপ্তি থেকে পুনর্জাগরণ। মৃত্যুর ওপারে গিয়েই উদ্দাম হাসি হেসে উঠব : স্বপ্নের ভিতর কত খেলা খেলে এলাম রে! ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম কতবার! সংসার-সংসার খেলে এসেছি—খেলা হলেও সময় সময় কিন্তু নিতান্ত মন্দ লাগে নি।

চোখ বুজে আছি। একফালি আলো ফেলল কে যেন। বোজা চোখের পাতার উপর আলোর ঘা দিল। চোখ মেলে তাজ্জব। সত্যি বলছি, নিশ্চিত মৃত্যুর আগের কথা অপ্রত্যয় করবেন না, অগুন্তি মানুষ আমার সেলের ভিতরে। মানুষের উপর মানুষ চেপে বসেছে। মরা মানুষ। এবং জ্যান্ত মানুষও। দূর-পিছনে যে বয়স

ফেলে এসেছি, সেই বয়সটা খুঁজে পেতে ফেরত চেয়ে নিয়ে জামার মতন গায়ে পরেছি।

গাঁয়ের বাড়ির দরদালানে কুলুঙ্গির ভিতর বসে আছি আমি। লাল গামছা মাথায় দিয়ে বউ হয়ে আছি। মা বলছেন, মুখ দেখি আমাদের রাঙা-বউয়ের—ফেরাও দেখি মুখখানা। হাঁ কর দিকি বউ। ওমা, মা, আমসত্ত্ব মুখের মধ্যে কেন বউয়ের? তাই এত লজ্জা!...

গুনগুন গুনগুন গুঞ্জন উঠছে আমাদের সেকালের পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায়। ছেলেরা দুলে দুলে পড়া তৈরি করছে। দ্বারিক পণ্ডিত মশায় জলচৌকির উপর বসে বারাণ্ডার খুঁটি ঠেস দিয়ে অঙ্ক লিখে দিচ্ছেন আমার শ্লেটে। শ্লেট ধুতে গেছে ক'জন ওই পুকুর-ঘাটে—কামিনীফুলতলায় ভাঙা রানার উপর উবু হয়ে বসে শ্লেট মাজছে। পশ্চিম-আকাশে পড়ন্ত সূর্য—প্রভাসের বজ্জাতি, সূর্যের উল্টো দিকে মেলে ধরে নাড়ছে শ্লেট। গোলাকার এক টুকরো রোদ নাচছে ওই সঙ্গে।

দেখুন পণ্ডিত মশায়, আমি অঙ্ক কষছি—প্রভাস তা করতে দেবে না।

পণ্ডিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলছেন, কোথায় প্রভাস?

ওই যে, দেখুন ওই কামিনীফুলতলায়। রোদ ফেলছে আমার চোখে।...

হঠাৎ কে ফিসফিসিয়ে আমার কানের কাছে বলে, ভয় করছে তোমার?

চমক লাগে। এতকাল পরে দরদ উথলে উঠল বুঝি প্রভাসের! এদিক-ওদিক তাকাই সেদিনের সেই দ্বারিক পণ্ডিতের মতন। কাউকে দেখি নে।

আবার বলছে, ভয় কিসের? কোন ভয় নেই, এক সঙ্গে মিলে-মিশে মজায় থাকা যাবে।

স্বর একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। প্রভাস নয়, বয়স্ক মানুষের

ভারি গলা। প্রভাস তবে বড় হয়ে ভারিক্কি হয়েছে। কিন্তু বয়স তো ওদের হয় না। কত বছর আগেকার চম্পা বিয়ের কনে আজও—বিয়ের রাত্রে ছাতের উপর চুরি করে বর দেখার কৌতূহল বেমানান লাগে না। একটু বদলায় নি, একটা দিনও বয়স বাড়ে নি তারপরে। প্রভাসেরও তাই। এ গলা অন্য কারও। তুমি কে?

স্পষ্ট গলায় এবার জবাব এল, দিব্যি আছি, বড্ড স্ফূর্তিতে রয়েছি। সব ভারবোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হালকা, মনও তাই। এত আমার জীবনে পাই নি। এস, চলে এস বাবাজি। খাসা থাকবে। আমি মিথ্যে বলছি নে।

আর সন্দেহ নেই। দয়ালহরি। চোখে না দেখেও চিনতে পারি। প্রথম কথাতেই চেনা উচিত। চিরকালের মোসাহেবি মিন-মিনে গলা আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়েছে—চিনে ফেলবার পরেও দ্বিধা কাটতে চায় না।

রাগ করেন নি হোড় মশায়?

রাগ কিসের? গুলি করে বুক ছেঁদা করলে, আমায় তো বাঁচিয়ে দিলে বাবাজি।

দেখতে পেলাম ফাঁসি-সেলের সাদা গরাদ লেপটে আছেন তিনি। জাল-জাল কাপড়ের উপর উল বুনে মেয়েরা ছবি তোলে, সেই রকম দেখাচ্ছে।

ব্যাধি আরোগ্য করে দিলে বাবাজি এক লহমায়। কী আরাম, কী আরাম! যতক্ষণ দলিল লিখি, এক রকমে সময় কেটে যায়। তারপরে এবাড়ি ওবাড়ি এর-তার তোয়াজ করে বেড়ানো। এতখানি বয়সের মধ্যে সুখশান্তি একটা দিনের তরে হল না। সুখ চুলোয় যাক, নিজের বাড়িতে দু-দণ্ড চোখ বুজে সোয়াস্তি নেব, তার উপায় নেই। বাইরে বাইরে টহল দিয়ে ফিরি। লোকে নাক সিঁটকায়ঃ বেটা খোশামুদে। শঠতঞ্চক বলে গালিগালাজ করে। কিন্তু বাপ-পিতামহ তালুকমুলুক রেখে যায় নি। কেউ লেখাপড়া শেখায় নি তোমার মত। সুপারিশের জোর নেই। কী করে

চালাই তবে ? ভালমানুষেরা হল বোকা মানুষ। বাহবা খুব মেলে, কিন্তু ভাত মেলে না। আমি সেই জন্যে ভাল হতে গেলাম না।

কথা শুনে কষ্ট হয়। বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছিল, সেই জায়গাটা নজর করে দেখছি : সে সময়টা বড্ড লেগেছিল হোড় মশায় ?

দয়ালহরি কানেও নিলেন না। বলছেন, সবই যে পেটের ধান্দায় করতাম, তা নয়। শেষটা নেশা লেগে গেল। মানুষকে বোকা বানিয়ে দুটো পয়সা বের করে নেওয়া, এর হকের সম্পত্তি ওকে পাইয়ে দেওয়া, এর মধ্যে বাহাদুরি রয়েছে। বুদ্ধির প্যাঁচ-কষাকষি। এক রকমের রোগও বলতে পার। মনে পড়ছে বাবাজি, ছোটবেলা সাঁতার কাটতে গিয়ে গাঙের টানে ভেসে যাচ্ছিলাম। আমার মেজোখুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুললেন। এবারে তুমি তুললে। পাঁকের ভিতর থেকে টেনে তুলে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছ। রক্তের সঙ্গে মনের ঝুলকালিও সব বেরিয়ে গেল। ফাঁকায় দম নিয়ে বাঁচছি।

আপনার বোধ হয় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, যখন আমার গুলি গিয়ে বিঁধল ?

কিছু না, কিছু না। এ ভারি মজা। ঠিক সময়টাতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, কোন রকম হুঁশ থাকে না। যন্ত্রণা যা কিছু গোড়ায়। মরব-মরব একটা আতঙ্ক। মিথ্যে বলছি নে বাবাজি। মাটির উপরে যতক্ষণ পা ছিল, দেদার মিথ্যে বলতাম। না বললে চলে না। এখন কী দায় ? বড্ড উপকার করলে তুমি আমার। কাপুরুষ আমি, নিজে থেকে কখনও সাহস হত না। সে কাজটা তুমি করে দিলে। এই পুণ্যফলে, দেখ, তোমারও ভাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর কতক্ষণ।

কতক্ষণ আর ? আমারও মনে মনে সেই প্রশ্ন। অধীর হয়ে পড়ছি। শুকতারা উঠবার সময় হল বোধ হয়। কখন প্রভুদের শুভাগমন হবে সেলের চাবি হাতে নিয়ে ? ফাঁসিতে লটকে দিয়ে

আমার এই মস্ত উপকারটা করবে? আরও কতজনকে লটকেছে এমনি, তবে তো বিস্তর পুণ্য ওদের। পুণ্যের ফলে ওদের কেউ লটকে দেয় না কেন? ভয় করে হয়তো। পুণ্য তো পাহাড়-প্রমাণ—আমার শত গুণ, সহস্র গুণ—ভয় করে, ফাঁসির দড়িতে অতখানি পুণ্যের ভর সইবে না। ছিঁড়ে পড়বে।

ছিঁড়ে পড়লে সে নাকি বিষম ব্যাপার। আর ফাঁসি দেওয়া চলবে না আসামিকে—সে তখন মুক্ত। আইনে সঠিক কী বলে জানা নেই, কথাটা দু-একদিন আগে উঠলে জেলর বাবুকে জিজ্ঞাসা করা যেত। সে যা-ই হোক, লোকের মধ্যে রটনা কিন্তু ওই। বিধাতাপুরুষ নামক এক অদ্ভুতকর্মা স্থপতি আব্রহ্মস্তম্ব জীবজগৎ গড়েছেন। তাঁর সঙ্গে একরকম বুঝসমঝ আছে বোধ হয় রাজ-পুরুষদের—ফাঁসির দড়িটা সড়াক করে নেমে গলায় এঁটে যাবে, দড়ি ছিঁড়লে কিংবা ফাঁস আটকে গেলে আর হবে না। পাঁঠাবলির মতন। এক কোপে কাটা পড়ল তো উত্তম। নতুবা বলি অসিদ্ধ—দেবতার সে পাঁঠায় রুচি নেই। ছুঁড়ে ফেলে দাও সেই পাঁঠা।

কত সাবধানতা ফাঁসি পণ্ড হবার এই ভয়ে! আমার ওজন নিয়েছে। ফাঁসির দড়িতে ওই ওজনের মাল টাঙিয়ে ছিঁড়ে পড়ে কি না, পরখ করে দেখেছে আগেভাগে। দড়িতে চর্বি ও কলা মাখাচ্ছে বারংবার—শুকিয়ে নিচ্ছে, আবার মাখাচ্ছে। টান দেওয়া মাত্রেই যাতে ফাঁস এঁটে যায়। তোড়জোড়ের অন্ত নেই। একখানা এই মোটা বই আছে ফাঁসি দেবার প্রণালী সম্বন্ধে। দুর্গোৎসব-প্রকরণ কোথায় লাগে তার কাছে! আইন-কর্তা কেমন স্বচ্ছন্দভাবে সবিস্তার লিখে গেছেন—লিখবার সময় আশেপাশে নিশ্চয় ঘুরছিল তাঁর ভালবাসার মানুষেরা। হয়তো বা দড়িটা মনে মনে তাদের গলায় বসিয়ে অবস্থার আন্দাজ করে নিয়েছেন।

কী আশ্চর্য, সেই কাণ্ড ঘটল যে সত্যি সত্যি। নিতান্তই আমার কপাল মন্দ—লাখের মধ্যে যা একটা শোনা যায় না।

আকাশে পুরানো সাক্ষি সেই পোহাতি-তারা। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় কিলবিল করছে কালো কালো ছায়ামূর্তিরা ফাঁসিক্ষেত্র ভরে। আইনের যত পাহারাদার—হাজির সবাই। সেলের পিছন-দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে পৌঁছেছে মঞ্চ অবধি। কাঁদে নাকি এই সময় কোন কোন আসামি—অজ্ঞান হয়েও যায়। একবার এক পাড়াগাঁয়ের স্টিমারঘাটে দেখেছিলাম, একটা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে আর বাড়িসুদ্ধ—খুব সম্ভব পাড়াসুদ্ধ—মেয়েলোক আর্তনাদ করছে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কি না, যাচ্ছে লোকটা পেটের ধান্দায় অজানা শহরে। প্রায় সেই ব্যাপারই তো!

ভূমি থেকে দেড়-মানুষ উঁচু হবে মঞ্চ। কিন্তু মনে হচ্ছে, অনেক—অনেক উঁচুতে আমি। প্লেনে চড়ে মেঘের ভিতর দিয়ে ধরণীর দিকে যেমন অবহেলার নজর পড়ে। আহা, জীবনের ব্যাধিতে ভুগছে মাটির গায়ে লেপটে-থাকা চারিদিককার এই সমস্ত লোক। এই সব কৃপার পাত্র। যেটুকু চোখে দেখতে পায়, তা-ই ভাবে পরম বস্তু। চাপা হাসিতে আমার যে দম ফেটে যাবার জোগাড়।

দুটো খুঁটির মাথায় একটা মোটা কাঠ—হরাইজেণ্টাল-বার অবিকল। তার মাঝামাঝি দুই আংটায় দড়ি পরানো। একেবারে এক সঙ্গে দুজনকে ঝোলানো চলে। হয়েও থাকে তাই একাধিক আসামি মজুত থাকলে। মাইনে-করা জহ্লাদ নয়, ঠিকে চুক্তি—এক-একটা মানুষের জন্য এত করে পাবে। দুটো মানুষ একবারে ঝোলানোয় পাইকারি হারে রেট বোধকরি কিছু কমই হবে।

গটমট করে দাঁড়িয়েছি এসে মঞ্চের তক্তার উপর, দড়ি-ঝোলানো আংটার নীচে। তৈরি আমি, শুরু কর এবারে প্রক্রিয়াগুলো। হাত দুটো বেঁধে দিল পিছনে—অবোধেরা ভেবেছে, ফাঁসির দড়ি আঁকড়ে ধরে আমি হয়তো যজ্ঞ পণ্ড করতে যাব। ঝোলানো টুপি মাথায়—চোখ-মুখ ঢেকে গেল। আমার

এত বড় উৎসব চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেবে না। বিড়বিড় করে কানের কাছে মন্ত্র শুনিয়ে গেল—পুরুত নয়, জহ্লাদ।—বাবু, আইন দস্তুর হামাকে এই কাম করতে হচ্ছে। হামার কসুর লিবেন না।

সকল দায় আইনকর্তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে খালাস থাকল। বিনয়ের দিক দিয়ে লোকটা বৈষ্ণব। বলা যায় না, ভূত হয়ে গিয়ে আমার কী রকম মতিগতি হবে। ঘাড় ভাঙতে হলে তাকে রেহাই দিয়ে অন্যদের যেন ঘাড় ভাঙি—মতলব হল এই। আমায় বলেকয়ে জহ্লাদ এবার হাতল ধরে দাঁড়িয়েছে। চোখ ঢেকে দিলেও কায়দাকানুন শোনা আছে। দাঁড়িয়ে আছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমের অপেক্ষায়। মুখে তিনি কিছু বলবেন না, রুমাল নিয়ে হাত তুলে আছেন। মুঠো খুলে ছেড়ে দিলেন রুমাল—ব্যস।

ঘড়াং করে আওয়াজ। পায়ের নীচের তক্তা সরে গেল। মরে গিয়ে হাত পাঁচ-ছয় নিচুতে ঝুলতে থাকব—কিন্তু এ কী হল? কী আশ্চর্য ব্যাপার! পড়ে গেলাম পাতকুয়ার মতন গর্তের তলায়। আছাড় খেয়ে ব্যথা লাগল, কিন্তু মরে গেছি কই? হায় রে, প্রহ্লাদ হয়ে গেলাম—পাপ কলিযুগে আমার মরণ নেই। জজ গম্ভীর মুখে রায় দিয়েছিল, তোমায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হবে যতক্ষণ না তুমি মারা যাও। রায় পড়েই এজলাস থেকে উঠে গেল, সেদিন আর কোন কাজকর্ম হবে না। যে-কলম দিয়ে রায় লিখেছে, সে কলমেও কাজ করবে না আর কখনও। কিন্তু হল না কিছুই, দড়ি ছিঁড়ে পড়েছে। কোনখানে অসাবধানে রেখেছিল দড়ি—ইঁদুরে কেটে দিয়েছে বোধ হয় চর্বি ও পাকা-কলার লোভে। অত আইনের কচকচি, জজের অত আড়ম্বরের রায় ইঁদুরের দাঁতে বানচাল হয়ে গেল।

হৈ-চৈ পড়ে গেছে। অন্ধকার গর্তের মধ্যে কানে আসে প্রতিটি কথা। ভারি গলায় কে-একজন বলল, লোকটার বড় কপালজোর।

যা কখনও হয় না, তাই ঘটল। চাকরি নিয়ে টান পড়বে আমাদের।

মঞ্চতলের ঘুলঘুলি খুলে ফেলল, যেখান থেকে মড়া বাইরে তুলে আনে ফাঁসির পর। ধরে নিতে হবে, ফাঁসিই হয়ে গেছে আমার—শাস্তিভোগের পর এবারে ছাড়া পাব। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছি। ক'জন ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল। হাতের বাঁধন কাটল, চোখের ঢাকা খুলে দিল।

চলে যান, জেল থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাকে আটকে রাখা এখন বেআইনি।

ভোরের আলো ফুটছে চারিদিকে। জেলের ফটক খুলে দিল। আমায় দেখে মাথা নিচু করে সিপাহিরা। নবজন্মের মানুষ।

রাস্তায় লোকজন কদাচিৎ দু-একটি। এখনও সব জেগে ওঠে নি। যখন শিক্ষানবিস ছিলাম, জেলখানার সামনের এই পথে নদীর ধার অবধি কতদিন বেড়াতে গিয়েছি। আট মাস পায়ে হাঁটি নি, অভ্যাস নেই। আজকে কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। চেনা একজনের সঙ্গে দেখা, এক হোটেলে খেতাম। হনহন করে খুব ব্যস্তভাবে সে চলেছে, ট্রেন ধরবে বোধ হয়। মুখ ফিরিয়ে একটুকু হেসে চলে গেল। নিশ্চয় আমার খবর রাখে না। তা হলে আঁতকে উঠত, থমকে দাঁড়াত, গাড়ি ফেল হয়ে যেত তার।

দীঘি। দীঘির পাড়ে জিমন্যাস্টিক-ক্লাবের মাঠ। এত ভোরে মাটি মেখে কুস্তিতে লেগেছে কয় জোয়ান। মাঠের পাশে একতলা বাসা।

বউদি, দোর খোল বউদি, আমি এসেছি—

বউদি দরজা খুললেন। লাবণ্য পিছনটিতে। অবাক হয়ে থাকেন মুহূর্তকাল। কথা বেরোয় না। বলতে গিয়ে ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে। ঝরঝর করে কেঁদে ভাসালেন।

টুন্নুমণি কোথায়? ঘুমুচ্ছ? ঘুমিয়ে থাকো তো 'হ্যাঁ' বলে ওঠ—

গলা শুনে ডাকাত ছেলে জেগে গেছে। দৌড়চ্ছে। বড় বড় চুল উড়ছে দৌড়বার বেগে। দু-হাত বাড়িয়ে আসছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

কাকামণি, আমি জানতাম তুমি আসবে। ঠিক আসবে। ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি। চোখ মুছিয়ে ঠাকুর বললেন, আজকেই এসে পড়বে তোর কাকু।

কতদিন টুনুকে কোলে তুলতে পাই নি। মরুভূমির উপর জল পড়লে যেমন হয়। আদরে আদরে অস্থির করছি। নাচাচ্ছি দু-হাতে তুলে, কাঁধে করছি, বুকে চেপে ধরছি—

আরে, আরে, অত জোরে গলা ধোরো না টুনুমণি, লাগে—

টুনুর বাহু নয়, ফাঁসির দড়ি। স্বপ্ন দেখছিলাম একটুকু সময়ে। মনোরথে চড়ে ছুটে এক পাক বেড়িয়ে এলাম। দয়ালহরি ঠিক বলেছেন—এক মুহূর্ত। মুহূর্তের এতটুকু আচ্ছন্ন ভাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভার বয়ে এসেছে এতদিন, হঠাৎ দায়দায়িত্ব একেবারে ছেড়ে দিল। নিরন্ধ্র অন্ধকার···সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলছি যেন। তারপর··· তার পরে আর কিছু নেই।

আমার মৃতদেহ ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা ঝুলল আঁটোসাঁটো গর্তের ভিতরে। তারপরে টেনে বাইরে আনে। ফেলে রেখেছে। রক্তাক্ত চক্ষুতারা বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে, জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে। কী বীভৎস! ওই মুখে ক্রিম ঘষতাম—মাথার চুলে গন্ধতেল মাখতাম, টেড়ি কাটতাম কত যত্নে! কাঁটা ফুটেছিল পায়ে, সারা রাত তার জন্য ছটফট করেছিলাম একদিন। থুঃ, থুঃ—এত মমতা বেঢপ ওই দেহটার উপর। রাজহংস নয়, পেখম-তোলা ময়ূর নয়—দুই ঠ্যাঙে চরে-বেড়ানো লম্বা ধিড়িঙ্গে মানুষের দেহ। হাড়ের ফ্রেমের গায়ে শিরা-উপশিরা আর মাংস—নিতান্ত

কুদর্শন বলেই উপরে একটা চামড়া। ময়লা-তোষক আর ছেঁড়া-কাঁথার উপরে চাদর ঢাকা দেয় যেমন। থুতু ফেলছি : থুঃ, থুঃ ; থুতু পড়ে না তো মুখ দিয়ে। লাথি মারব ওই কুৎসিত দেহটার উপর, পায়ের ধাক্কায় দৃষ্টির আড়ালে সরাব। ছুঁতে পারি নে, পায়ে স্পর্শ পাই নে। বায়ুভূত হয়ে গেছি।

—

লেখক-পরিচিতি

কী উদ্দীপনা তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে! ছোট্ট গ্রামেও জোয়ার এসেছে। হাটখোলায় সভা। নিশান উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোক এসে জমছে। চাষী-মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সবাই। বিলাতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। বিলাতি নুন জলে ঢেলে দিচ্ছে। সভাপতি হলেন মনোজ বসুর বাবা। মাথায় টাক, টকটকে ফরসা পৌরুষময় চেহারা—বাপের সম্বন্ধে এমনি একটু ঝাপসা ছবি মনে রয়েছে মনোজ বসুর। সভাপতি বক্তৃতা করছেন—দেশপ্রেমী তরুণদের নির্যাতনের কথা। অগণ্য শ্রোতার মধ্যে এক শিশুও শুনছে তদগত হয়ে। বাড়ি গিয়ে বাপ ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, বড় হয়ে অমনি হতে হবে, দেশের কাজে তোমার ফাঁসিও যদি হয়, পরলোক থেকে আমি আনন্দ পাব। কথাগুলো মনে গেঁথে আছে মনোজ বসুর। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন তিনি, ছাপা হয়ে তখনকার কোন কোন কাগজে বেরুত। বই কিনতেন অনেক। ঠাকুরদাদাও লিখতেন, মহাভারতের অনেকখানি বাংলা তর্জমা করেছিলেন, গোটা গোটা অক্ষরের সেই পাণ্ডুলিপি শৈশবে মনোজ বসু দেখেছেন। আর একটা কথা মনে আছে। বাবা একদিন বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী নিয়ে আসতে বললেন পাশের বাড়ি থেকে। কে বঙ্কিমবাবু? বই লিখতেন, খুব নাম তাঁর, সকলে পড়ে তাঁর বই। গ্রাম্য বালকের লোভ হল, বই লিখবে সে বড় হয়ে।

বাবা মারা গেলেন আট বছর বয়সে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার। সম্পত্তি অল্প, কিন্তু খাতির-সম্মান প্রচুর। এ অঞ্চলের প্রথম ইংরেজি-জানা মানুষ এই পরিবারের। রুজি-রোজগারে বিদেশে বেরুলেন সর্বপ্রথম এই বাড়ি থেকেই। কলকাতায় ও মজিলপুরে থেকে বাবাও বিস্তর আয় করতেন। তাঁর মৃত্যুতে সংসারের শোচনীয় অবস্থা—অন্ন জোটানো দায়। কিন্তু অনটনের কষ্ট যতই হোক, অবস্থাটা বাইরে প্রকাশ না পায়—বাড়িসুদ্ধ সকলের মর্মান্তিক চেষ্টা সেজন্য।

মানুষ হব—শুধুমাত্র এই জেদেই চলল তাঁর লেখাপড়া। পাশের গ্রামের হাই-ইস্কুলে পড়েন। দৌলতপুরে গোপন বিপ্লবকেন্দ্র। গাঁয়ে গাঁয়ে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। শরীর-চর্চার হিড়িক পড়ে গেল। চরিত্র-গঠন, দেশপ্রেম ও বিপ্লব সম্পর্কিত বই পড়ানো হয় গোপন ক্লাস করে। একদিন সেই সময়ে যতীন মুখুজ্জে এসেছিলেন সেই সুদূর গ্রামে।

এর পরে কলকাতায় পড়াশুনো। বাগেরহাটে নতুন কলেজ হল, সেখানে গিয়ে ভর্তি হলেন। টেস্ট পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করে ফী জমা দিতে গেছেন, সেই দিন অসহযোগ করে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বেরুল, নেতা তিনি। প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যা নাগকে ছেলেরা দেবতার মত দেখত। ডেকে নিয়ে তিনি সজল চোখে বললেন, বড্ড কঠিন পথ; কিন্তু একজন কেউ ফিরে এসেছ তো আমায় আর পাবে না। সেকালে শিক্ষকদের বহুজন এমনি ছিলেন। ক্লাসের বক্তৃতা পুরাপুরি স্বদেশি বক্তৃতা হয়ে উঠত সময় সময়। ছাত্রদের মুখপাত্র হয়ে মনোজ বসু কলকাতায় দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর গ্রাম অঞ্চলে স্বদেশি বক্তৃতা ও খদ্দর-প্রচার চলল অনেক দিন। আন্দোলন স্তিমিত হলে কামাখ্যাবাবুর আশীর্বাদ ও পরামর্শ

নিয়ে পরীক্ষা দিলেন। পরের পড়াশুনো কলকাতায়। মাস্টারিতে ঢুকলেন, সঙ্গে আইন পড়ছেন। আইন পাশ করে মাস্টারি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু অনেক দায়-দায়িত্ব কাঁধের উপর—একেবারে অনিশ্চিতের পিছনে ছোটা চলে না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত মুক্তি চাইছেন, তবু মাস্টারি চলল কুড়ি বছর। তার সঙ্গে ট্যুইশানিও। অন্তরাত্মার মরে যাবার কথা, বাঁচিয়ে রেখেছে সাহিত্য। যেটুকু অবসর পান, পড়েন ও লেখেন। গাঁ অঞ্চলে গিয়ে মেলামেশা করেন সকলের সঙ্গে। যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে ভারতের নানা অঞ্চল দেখেশুনে বেড়ান। বিশ বছর এমনি কাটিয়ে মাস্টারি ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এলেন।

কল্লোল এবং আর কয়েকটা কাগজে দু-চারটে কবিতা বেরিয়েছে। ভালও লেগেছে অনেকের। তখনকার প্রখ্যাততম কাগজ প্রবাসী, বিচিত্রা ও ভারতবর্ষে একদিনে তিনটে গল্প পাঠালেন ডাকযোগে। বিচিত্রায় সকলের আগে বেরুল। শুধু তাই নয়, সম্পাদক গৃহে আহ্বান করে অজস্র প্রশংসা করে নতুন লেখককে আকাশে তুলে দিলেন; আরও গল্প চাইলেন। তারপর প্রবাসীতে বেরুল 'বাঘ'। ঐ এক গল্পেই সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। প্রথম বই 'বনমর্মর' প্রবাসী-কার্যালয় প্রকাশ করলেন। রাতারাতি প্রতিষ্ঠার এই দুর্লভ সৌভাগ্য না হলে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কতদিন তাঁর সাহিত্য-নিষ্ঠা টিকে থাকত, সন্দেহের বিষয়।

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিয়াল্লিশের আন্দোলন অবধি। স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও কংগ্রেস নিয়ে বহু গল্প-উপন্যাস মনোজ বসুর। সাংগঠনিক উপন্যাসও আছে। গুরুসদয় দত্তের সভাপতিত্বে এবং জসিমউদ্দিন ও তাঁর সম্পাদকতায় পল্লীসম্পদ-রক্ষা' সমিতি গঠিত হয়। বাংলার চিরাচরিত শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবনধারার পরিচয় নিয়েছেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে। এই বস্তুই ব্যাপকতর হয়ে ব্রতচারীর রূপ নিল। ব্রতচারীর গঠন-কর্মে তিনি অন্যতম নেতা। ব্যক্তিত্বময় আত্মবিশ্বাসী মানুষ, গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাতে একেবারে নারাজ। পুরস্কার বা তিরস্কার তাঁর পথ থেকে তিলেক বিচলিত করতে পারে নি। জাতীয় জীবনের নানা সমস্যায় এবং ব্যক্তি-জীবনের বহু ক্ষেত্রে তার পরিচয় আছে।

দেশভ্রমণ ও মানুষকে জানার আবাল্য বুভুক্ষা, অবশেষে তার বৃহত্তর সুযোগ এলো। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইতিপূর্বে তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের বহু অঞ্চলে ঘুরেছেন। ১৯৫২ অব্দে নবীন-চীনের আমন্ত্রণে একতম ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে চীনদেশে যান। ভারতীয়দলের নেতৃত্বও করেছিলেন ঐ সময়ে কিছুদিন। দু বছর পরে ১৯৫৪ অব্দে সোবিয়েত দেশের নিমন্ত্রণে রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার বহু অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৭ অব্দে জর্মন আকাদেমি অব আর্টস, চেক লেখক-সমিতি ও পোলিস লেখক সমিতির আমন্ত্রণে ইয়োরোপের নানা দেশ ঘুরে এসেছেন। এই সব ভ্রমণ নিয়ে লেখা বইগুলো বাংলা সাহিত্যে এক নব অধ্যায়ের যোজনা করেছে।

গল্প-উপন্যাস নাটক ও ভ্রমণ-কথা লিখে অগণ্য পাঠকের অনুরাগ অর্জন করেছেন। প্রত্যেকখানি বই সংস্করণের পর সংস্করণ বিক্রিত হয়ে তার পরিচয় দিচ্ছে। বহু নাটক রঙ্গমঞ্চে বিপুল সমাদরে অভিনীত হয়েছে, বহু কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষা, প্রতিটি ছত্র আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল। নিরলস সাহিত্য-শিল্পী—নব নব উদ্ভাবনার বিরাম নেই। গতানুগতিক ধারাবর্জিত বর্তমান উপন্যাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।